শাশ্বতী

শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য—দুই টাকা আট আনা

প্রিন্টার—শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখার্জ্জী
এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কারো কারো জন্ম হয় হুকুম করিতে, তারা সারাজীবন শুধু হুকুম করিয়াই যায়, আর কারও কারও জন্ম হয় হুকুম তামিল করিতে, তারা সমস্ত জীবন ধরিয়া অন্যের হুকুম মত কাজ করে। বীরবল ছিল প্রথমোক্ত শ্রেণীর মানুষ। যখন যে কোন নূতন অবস্থার বা পরিস্থিতির মধ্যেই সে পড়িয়াছে—বিনা চেষ্টায়, বিনা প্রচারে কখন যে সে আপনা থেকেই সকলের নেতৃস্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। এজন্য অনেকে তাকে ঈর্ষা করিয়াছে, অনেকে নানারকম কুৎসা প্রচার করিয়াছে, কেউ বা তার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাইয়াছে তাকে সাধারণের সমভূমিতে টানিয়া আনিতে। কিন্তু যে অদৃশ্য হস্ত জন্মাবধি তাকে সাধারণের পর্যায়ভুক্ত হইতে দেয় নাই, ঈর্ষা-প্রণোদিত সমস্ত চেষ্টা তারই অমোঘ শক্তিতে ব্যর্থ হইয়াছে।

অথচ বীরবল পাড়াগাঁয়ের সাধারণ আবেষ্টনীতেই মানুষ, পাড়াগাঁয়ে আর দশজনের মতই জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইয়া সে বড় হইয়াছে।

বীরবলের পিতা শিবেশ্বরবাবু মধ্যবিত্ত কায়স্থবংশীয়। পূর্ববঙ্গের কোন এক বড় জমিদারের মধ্যে তহশীলদার ছিলেন, জীবনের অধিকাংশ ভাগ অন্যের অর্থ নাড়াচাড়া করিয়া অর্থের উপর যে নিজের কোন স্বামীত্ব থাকিতে পারে এটা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছেন। যৎসামান্য পেন্‌সন্‌ নিয়া দেশে বসিয়াছেন, দাবা এবং মাছধরা এখন তার বাকী [illegible]। দশ বৎসর ধরিয়া বিপত্নীক।

বীরবলের বড় দুই ভাই এবং ছোট এক ভাই। জ্যেষ্ঠ সুবল

গ্রামের ইংরেজী স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করিয়া যখন দেখিল যে তা
বয়সই শুধু বাড়ে, জ্ঞান বা বিদ্যা মোটেই বাড়ে না, অথচ অন্যা
সকলের এই উভয় জিনিষই বাড়ে, তখন সক্রোধে বিদ্যালয় পরিত্যা
করিল। অবশ্য প্রথম কিছুদিন মনে মনে খুবই অশান্তি ভোগ করি
কারণ শিক্ষকের পক্ষপাতিত্ব, সময়ের অভাব, সাংসারিক কার্যে
প্রাচুর্য প্রভৃতি কোন একটা কৈফিয়ৎই সে মনে মনে নিজের কা
খাড়া করিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনারূপ প্রবোধ দ্বারা নিজেকে তৃপ্ত করি
পারিল না। কোন এক বন্ধুর পরামর্শে মহেশ ভট্টাচার্য্যির হোমিও
প্যাথীর বই ও বাক্স কিনিয়া স্থবল দেখিল যে এ ত ইংরেজী স্কু
পড়ার চেয়ে অনেক সোজা, কারণ স্কুলে যিনি পরীক্ষক তিনি ছাত্রে
চেয়ে অনেক বেশী জানেন কিন্তু এখানে পরীক্ষক রোগী, যাদের প্রা
সকলেই নিরক্ষর চাষাভুষা এবং ছাত্র ডাক্তার, যার উপর প্রশ্ন করিবা
সাহস রোগীর ত অন্ততঃ কোনদিন হয় না। প্রায় পনের বৎস
ধরিয়া স্থবল এই হোমিওপ্যাথী করিতেছে। বহু রোগী মারি
এবং বহু রোগীর মরিবার পথ পরিস্কার করিয়া আজ সে বিবেকদংশ
মুক্ত। তবে সৌভাগ্যের কথা হোমিওপ্যাথীতে ইচ্ছা করিলেও ও স
সময় এলোপ্যাথীর মত শুধু ওষুধ খাওয়াইয়া রোগী মারা যায় না
স্থবলের স্ত্রী অন্নপূর্ণাই সংসারের কর্ত্রী, তিনি নিঃসন্তানা।

দ্বিতীয় দেবল গ্রামের জমিদারের সখের থিয়েটারের দলে নায়িক
সাজে। নাকি নাকি মিহিস্থরে সে যখন স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয় করে
তখন শ্রোত্রীদের মধ্যে নাকি একটা সাড়া পড়িয়া যায়। দিবারাত্রি
অধিকাংশ সময়েই জমিদারের বহির্বাটীতে কাটে। সংসারে ম
বসাবার জন্য শিবেশ্বরবাবু অল্প কিছুদিন হয় বিবাহ দিয়াছেন। নব
বিবাহিতা পত্নী রমা নাবালিকা বলিয়া এখনো পিত্রালয়ে।

কনিষ্ঠ অবল দ্বাদশবর্ষীয় বালক, গ্রামের স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়ে। সংসারের পক্ষে যেমন অপ্রয়োজনীয়, এই আখ্যায়িকার পক্ষেও।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে কোন এক পরিবারের পিতা, মাতা বা পুত্রকে জানিতে হইলে যেমন শুধুমাত্র তাকে জানিলেই চলে, প্রত্যেকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ, প্রাচ্যদেশসমূহে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে সেটা খাটে না। সেখানে প্রত্যেকটি লোক তার সমগ্র পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। কাজেই কোন একজনকে বুঝিতে হইলে সমগ্র পরিবারকে বুঝা প্রয়োজন। বীরবলের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাই বীরবলকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার জন্য তার পরিবারের একটু পরিচয় দেওয়া হইল।

পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী সর্বদেশেই শিশুদের ও বালকদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। আমি যে অন্য সকলের চেয়ে বড়, আমার আত্মীয়স্বজন বা পরিচিতদের মধ্যে আমি যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছি, আমার পরিবারের প্রত্যেকের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে আমার শ্রেষ্ঠত্ব যে অন্যান্য সকলে নিঃসন্দেহে স্বীকার করে, এইরূপ ভাব ও ধারণা যদি শিশুমনের পরিপুষ্টিতে সহায়তা করে, তবে নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা তার ভিতরে অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়। কখনও কখনও তার বিকাশকে আকস্মিক মনে হয়, কারণ তার পিছনের গোপন সাধনার কথা মানুষ বিস্মৃত হয়। বীরবল সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। ফুটবল খেলায়, নৌকাবাইচে, মারামারিতে, যাত্রাগানের আসরে, তার মোড়লি হয়ত খুব স্বাভাবিক এবং সহজ মনে হয়, কিন্তু ততটা সহজ নিশ্চয়ই মনে হইত না, যদি বাড়ীতে শৈশব থেকে এই শিক্ষা সে না পাইত, যে অন্য ভায়েদের চেয়ে সে মেধাবী, সে শ্রেষ্ঠ, সে শক্তিমান। শৈশব থেকে এই যে একটা

শ্রেষ্ঠত্বের ভাব তার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়েছিল, উত্তর জীবনে ইহাই তাহার জীবন নিয়ন্ত্রনে অনেকখানি অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

মায়ের স্মৃতি বীরবলের মনে অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। মানুষের মন চিরকালই স্নেহকাঙাল। শৈশবে মায়ের, কৈশোরে দিদি ও বৌদিদের, যৌবনে স্ত্রীর, প্রৌঢ়াবস্থায় পুত্রবধূ ও কন্যাদের স্নেহধারায় সে পুষ্ট ও তৃপ্ত থাকে। জীবনের যে অবস্থায়ই সে এই নারীস্নেহে বঞ্চিত হয়, সেই অবস্থায় জীবন তার ব্যর্থ ও নিষ্ফল মনে হয়, বাঁচিয়া থাকাটা বিড়ম্বনা মনে হয়।

শৈশবে এই অনাবিল নারীস্নেহ বীরবলের জীবনতরু রস ঘন পরিবেশে স্নিগ্ধ ও সার্থক করিয়া তোলে নাই, মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি একখানি স্নেহব্যগ্র মমতা কোমল হস্তের সেবালাভের জন্য উন্মুখ হইয়াই রহিয়াছে—পিতার স্নেহ, বৌদির ভালবাসায় যেন তার অন্তরকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই।

অধিকাংশ বিখ্যাত কাব্য বা উপন্যাসের নায়কের এমন একটা বৈশিষ্ট্য তার দেহমনে বিকশিত হইয়া উঠে যে তাকে নায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে অতি সাধারণ পাঠকেরও দ্বিধা থাকে না। পূর্বাচার্য-গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বীরবলেরও সেই রকম একটা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান আমরা পাইয়াছি। সেটা অবশ্য তার মনে নয়—দেহে। সাধারণ দোহারা গোলগাল চেহারা, বড় বড় চোখ, ম্লান শ্যামবর্ণে নায়কোচিত ঔজ্জ্বল্য বা স্নিগ্ধতা কোনটাই নাই। কিন্তু পর্বতের সুউচ্চ চূড়া যেমন চারিপার্শ্বের সমতল ভূমিকে বহু নিম্নে রাখিয়া সগর্বে মাথা উঁচু করে, বীরবলের প্রখর নাসিকা সদর্পে তার সর্বাঙ্গ ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভীড়ের মধ্যে বীরবলকে লক্ষ্য না করিয়া হয়ত অনেকেই পারিত, কিন্তু তার নাসিকার লক্ষ্য

অব্যর্থ। দূর হইতে জাহাজের মাস্তুল দেখিয়া যেমন জাহাজের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়, জনতার মধ্যে তদ্রূপ অত্যুন্নত সুদীর্ঘ নাসিকা দেখিয়া বীরবলের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যাইত।

কেউ কেউ বলেন বীরবলের প্রসিদ্ধির মূলে ও এই নাসিকা। যারা নেতা বা নায়ক হইতে চান, তারা প্রথমতঃ নিজেকে সকলের নিকট পরিচিত করেন, এবং তারপর সেই পরিচিতির সুযোগে সাধারণের মনে একটা স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষের ধর্মই এই—পরিচিতকে যত সহজে বিশ্বাস করিয়াথাকে অপরিচিতকে তত সহজে করে না।

বীরবল গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করিলে তার পিতা শিবেশ্বরবাবু স্থির করিলেন ছেলেকে কলেজে পড়াইবেন—এটা তার বহুদিনের পোষিত একটা আশা। ছেলে কলেজে পড়িয়া বি, এ পাশ করে, পাড়ার দশজনের কাছে তার মুখ উজ্জ্বল হয়, কন্যার পিতারা মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত তার চরিদিকে মধুচক্রের রচনা করে, ইহা তাহার জীবনের এক চরম ও পরম সাধ। বড়ছেলে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করিয়াছে, দ্বিতীয়টি কোন আশা করিবার সুযোগ ঘটিতে দেয় নাই। এখন ভরসা তার তৃতীয় পুত্র বীরবল। চতুর্থ পুত্র অবলের উপর ভরসা স্থাপন করিতে তিনি ভরসা পান না, কারণ ততদিন বাঁচিবার আশা তার নাই।

শিবেশ্বরবাবু বীরবলকে ডাকিয়া নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। সুবল ও দেবলের বিবাহ দিয়া ইহাদের সম্বন্ধে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বীরবল ও অবল—মাতৃস্নেহবঞ্চিত এই দুই মন্দভাগ্য সন্তান! কুলপ্লাবিনী স্রোতস্বিনীর মত পিতৃস্নেহ অজস্রধারায় উৎসারিত হইয়া ইহাদের অভিষিঞ্চিত করিতে চায়, পক্ষিমাতার

মত আপন বিপুল পক্ষপুটে ইহাদের স্নেহশীতল আশ্রয়ে রাখিতে চায়।

প্রায় একমাস ধরিয়া রোজ রাত্রেই খাওয়া দাওয়ার পর পিতাপুত্রে সুদীর্ঘ আলোচনা হইত বীরবলের ভবিষ্যৎ কলেজ জীবন সম্বন্ধে। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে বীরবলের চেয়ে তার পিতার জ্ঞানের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত ছিল না।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে বীরবল যেন পিতার হৃদয়ের এক অনুদ্ঘাটিত দিকের সন্ধান পাইয়া পুলকবিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কত স্নেহময় কত করুণাময় কত মমতাপরায়ণ তার এই সংসার নির্লিপ্ত পিতা! কত ভাবনা তার সন্তানের জন্য! কত ব্যাকুল তিনি তাদের মঙ্গলের জন্য! সন্তানবৎসলা জননীর মত সন্তান বিরহাশঙ্কায় তিনি ম্রিয়মান। অজ্ঞাতেই বীরবলের হৃদয় ভেদিয়া এক দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহির হইল।

[দুই]

বীরবল ঢাকা জগন্নাথ কলেজে আই, এস্, সি ক্লাশে ভর্ত্তি হইল। গ্রামের স্কুল থেকে সহরে কলেজে পড়িতে আসার পরিবর্ত্তন এত অভাবনীয় ও অচিন্তিতপূর্ব্ব যে তাহার আকস্মিকতায় বীরবলকে প্রথম প্রথম স্তম্ভিত করিয়া দিল। কী অবাধ উন্মুক্ত স্বাধীন জীবন! এ যেন গিরিবিধৌতা স্রোতস্বিনীর অকস্মাৎ সমুদ্রে প্রবেশ! বিপুল স্বাধীনতার বিপুলতায়, বিভিন্ন মতবাদের প্লাবনে, বিপুল কর্ম্মপ্রবাহের ব্যস্ততায় জগতে জীবন্ত প্রাণশক্তির প্রত্যক্ষ স্পর্শলাভ! প্রথম

সুরাপানে সুরাপায়ী যেমন তার প্রত্যেকটি শিরায় এক অভিনব মত্ততা লাভ করে, শরীরের সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলী যেমন উন্মুখ যৌবনের প্রবল কম্পনে শিহরিয়া উঠে, বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, দলিয়া মথিয়া, নিপীড়িয়া নিষ্পেশিয়া, লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিবার জন্য শরীরের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু আবেগ চঞ্চল হইয়া উঠে, কলেজ জীবনের প্রথম প্রভাতে বাংলার দ্বিতীয় নগরী ঢাকার এক চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া বীরবল তার সমস্ত শরীরে সেইরূপ এক অনুভূত কম্পন অনুভব করিল। অবাধ, উন্মুক্ত আনন্দের এক প্রাণস্পর্শী উচ্ছ্বাস তার চারিদিকের জল, স্থল, আকাশ, বাতাস রাস্তাঘাট প্লাবিত করিয়া দিল—সমস্ত একাকার হইয়া তার বহিঃচৈতন্যকে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, মনের অবচেতন কোণে একটি অনুভূতি শুধু জাগিয়া রহিল—আজ সে স্বাধীন। দিনে, রাত্রিতে, মধ্যাহ্নে, প্রভাতে, অপরাহ্নে, সায়াহ্নে, কলেজে, হোষ্টেলে সর্ব্বত্রই সে স্বাধীন। তার গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার, তার সমগ্র দিবসকে চালিত করিবার আজ কেউ নাই। প্রবল আনন্দ তার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিকে নিঃসাড় করিয়া ফেলিল। তার ইচ্ছা হইল সমগ্র সহরের প্রত্যেকটি রাস্তার লোককে চীৎকার করিয়া তার নবলব্ধ স্বাধীনতার কথা জানাইয়া দেয়, নিজের বিরাট আনন্দের অংশ প্রত্যেককে গ্রহণ করিতে বলে।

বীরবলের কলেজ জীবন আরম্ভ হইল। স্কুল জীবনে, বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করায় তাকে যে কেউ সম্মান দেখাতে পারে, এটা সে ভাবিতে পারে নাই। বাড়ীতে যেমন স্নেহ ও শাসন, এই দুইটিতেই তার অধিকার ছিল, স্কুলেও তেমনি ভর্ৎসনা ও পীড়ন এবং পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে নিন্দা বা প্রশংসা।

বালিকা যেমন বয়ঃসন্ধিক্ষণের কোন এক মন্থির প্রভাতে

হঠাৎ চমকিয়া আবিষ্কার করে যৌবনের বিজয়নিশান তার দেহপ্রান্তে, কলেজ জীবনে প্রবেশ করিয়া বীরবল হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিল, সে আর বীরবল বা বীরু নয়, সে তার সমপাঠীদের কাছে বীরবলবাবু। নবলব্ধ এই আত্মপ্রসাদ ও কলেজ জীবনে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছিল।

কলেজ জীবনের প্রারম্ভেই বীরবলের আর একটি সদ্যলব্ধ চেতনা নারীর-অস্তিত্ব সম্বন্ধে নূতনভাবে সচেতন হওয়া। সে নারীকে তিন ভাবে দেখিতে অভ্যস্ত ছিল—প্রথম—ফ্রকপরা বা নেঙটা ছোট ছোট মেয়ে। দ্বিতীয় অবগুণ্ঠিতা অন্তঃপুরস্থিতা বধুগন, তৃতীয় প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা পাড়া ভ্রমনতৎপরা বিধবা। কিন্তু কলেজ জীবনে প্রবেশ করিয়াই বহুদিনের বদ্ধমূল সেই ধারণা তাকে পরিবর্ত্তন করিতে হইল। নারীর আর একটি বিভাগ সম্বন্ধে তাকে সম্পূর্ণ অবহিত হইতে হইল এবং সেটিই যে সমগ্র নারী শক্তির প্রাণকোষ, পরবর্ত্তী জীবনে ইহা সে নিঃসঙ্কোচে এবং নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়া নিয়াছিল। বাসে, ঘোড়ার গাড়ীতে, স্কুল বা কলেজের রাস্তায় পদব্রজে, বৈকালে নদীর ধারে যে মহিলাদের নিঃসঙ্কোচ ও সহজ ভ্রমণ তার কলেজ জীবনকে অধিকতর আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল, শিক্ষাব্রতী সেই সমস্ত মহিলাদের প্রতি একটা গভীর সম্পূর্ণ ভাব বীরবলের শেষ জীবন পর্যন্তও অবিকৃত ছিল।

বীরবল কলেজ সংশ্লিষ্ট হোষ্টেলেই উঠিল। একনব উন্মাদনায় লঘু পক্ষ মেঘের মত তার দিনগুলি যেন উড়িয়া যাইতে লাগিল। সহরের কী অফুরন্ত প্রাণশক্তি! মানুষের কী—অসীম কর্মব্যস্ততা! মোটর, বাস, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতির কী গতিবেগ ও চাঞ্চল্য! একটি লোকও আস্তে আস্তে হাটে না বা ধীরে সুস্থে কথা বলে না।

হোষ্টেল, কলেজ, নদীর ধার, সিনেমা, সব মিলিয়া এক প্রবল উত্তেজনার ভিতর বীরবলের দিন কাটিতে লাগিল।

সেদিন করোনেশন পার্কে রাজবন্দী মুক্তি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মিটিং। এক প্রধান মুসলমান নেতা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের কোন এক বিখ্যাত নেতা প্রধান বক্তা। পিপীলিকা শ্রেণীর মত কাতারে কাতারে লোক আসিয়া পার্ক ভরিয়া ফেলিয়াছে। বীরবলও একদল বন্ধু সহ সেখানে উপস্থিত। শুনিল পাঞ্জাবী নেতা উর্দ্দুতে বলিতেছে—"ভাই সব! এরকম ভাবে বসে থাকলে ত আর চলবে না? দেশের এরাই প্রকৃত সহীদ। এদের মুক্তি আমরা চাই। আমরা কি ঘরে চুপ করে বসে থাকব, আর এরা—দেশের জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণ এই যুবকেরা—পলে পলে, তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হবে? না, তা হতেই পারে না। ভেবেছ কি, এদের ত্যাগের পরিমানটা? ঘরে হয়ত কারও স্ত্রী অর্দ্ধাহারে মৃতপ্রায়, কারও পুত্র-কন্যা অন্ন ও বস্ত্রাভাবে পথের ভিক্ষুক, কারও পিতা মাতা উপার্জ্জনক্ষম বা উপার্জ্জনশীল একমাত্র পুত্রের কারাবাসে অর্থাভাবে আত্মহত্যা করেছে! আর এরা—তবু এরা হিমালয়ের মত অটল, সমুদ্রের মত স্থির, পৃথিবীর মত সহনশীল।"

কি এক প্রবল উত্তেজনায় বীরবলের সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। নাক, কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল, হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল। বক্তার অনলস্রাবী বক্তৃতা, তার প্রত্যেকটি কথা যেন সজোরে তার হৃৎপিণ্ডে আঘাত করিতে লাগিল। বক্তা তখন সুউচ্চ কণ্ঠে বলিয়া চলিয়াছে—"যুবক বন্ধুগণ! তোমরাই দেশের আশা ভরসা, তোমরাই দেশের বলবীর্য, তোমরাই দেশের মুক্তি পথ প্রদর্শক। তোমরা এদের বাঁচাতে না এগিয়ে আসলে আর আসবে কে?

বীরবলের কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল, সে চিত্তস্থৈর্য হারাইয়া ফেলিল। উন্মাদের মত সে ছুটিয়া বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইল।

হঠাৎ কে তাহার জামার খুঁট ধরিয়া টানিল। বিরক্ত ভাবে তাকাইতেই দেখে এক সুবেশ যুবক তাহাকে ইসারায় বাহিরে যাইতে বলিতেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বীরবল বাহিরে আসিল।

যুবকটি বলিল—"চলুন, একটু বাইরে যাই। আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকারী কথা আছে।" তাহারা দু'জনে বাহিরে আসিল।

বীরবল অবাক বিস্ময়ে যুবকটির দিকে তাকাইয়া বলিল—"বলুনত কি দরকারী কথা! আপনাকে কথনো দেখেছি বলে ত মনে হয় না"।

যুবকটি বলিল—"আপনাকে আমি চিনি। আজ কয়দিন থেকেই আপনাকে লক্ষ্য করছি। আচ্ছা সন্ত্রাসবাদ কাকে বলে আপনি জানেন?"

বীরবল একটু আশ্চর্য হইয়া তার মুখের দিকে তাকাইল। তারপর বলিল—"কেন বলুন ত?"

মনে মনে একটু ভয়ও হইল। তার এক গ্রামসম্পর্কের কাকা কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেন। তার কাছে বীরবল বিপ্লবীদের সম্বন্ধে নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়াছে। এ যুবকটি তাদের দলের নয় ত?

যুবকটি বীরবলের মনের আঁচ পাইল। বলিল—"আপনি দেখছি নাম শুনেই ভড়কে গেলেন। সব দেশে ছাত্ররাই স্বাধীনতার বার্তাবহ, বিপ্লবের অগ্রদূত। চীনের ছাত্র আন্দোলন সে দেশের রূপ একেবারে বদলে দিয়েছে। আপনি সান্ ইয়াৎ সেনের নাম শুনেছেন?"

বীরবল সান্'ইয়াৎ সেনের নাম শোনে নাই। কিন্তু তাহা স্বীকার

করিতে লজ্জাবোধ করিয়া এরূপভাবে ঘাড় নাড়িল যাতে 'হ্যাঁ'/ই বুঝা যায়, তবে না-ও বুঝা যাইতে পারে।

যুবকটি বলিয়াই চলিল—"এই সান্ ইয়াৎ সেন চীনের ছাত্রদের মনে এমন এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, যার প্রভাবে চীন আজ পরাধীনতার নাগপাশমুক্ত। চীনের ছাত্র আন্দোলন এবং তার পরিণতি আমাদের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করেছে।"

বীরবল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, অথচ কিছু যে একটা বলা উচিত এবং না বলিলে অশোভন হয় এই ভাবিয়া মনে মনে অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল।

যুবকটি বলিল—"রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ সমস্ত আলোচনা চলে না, আপনাকে একদিন আমাদের বাসায় নিয়ে যাব। দেশের বিষয় ভাব্‌বার এবং দেশের কাজ করবার আমাদের যথেষ্ট প্রয়োজন এবং সুযোগ আছে। দেশের সুপ্তপ্রায় গণচেতনাকে জাগ্রত করার ভার যে ছাত্রদেরই নিতে হবে।"

বীরবল আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। পরাধীনতা, দাসত্ব-শৃঙ্খল, বিদেশীর কবলমুক্ত প্রভৃতি কথার সঙ্গে তার পরিচয় মোটেই ছিল না। জানিত না যে সাধারণ বক্তৃতামঞ্চে যে কোন প্রসিদ্ধ বক্তাই বক্তৃতা করেন, তার বক্তৃতার মধ্যে এই কয়টি কথা বহুবার এবং বহুভাবে থাকিবেই।

সে শুধু ধীরে ধীরে বলিল—"আমাদের করবার অনেক আছে? কি জানি এ বিষয়ে কখনো ভাবিনি, অবশ্য ভাবার সুযোগও পাইনি।"

যুবকটি বলিল—"তাই ত আপনাকে আমাদের বাড়ী যাবার নিমন্ত্রন করছি। আপনার কাছ থেকে দেশ অনেক কিছু আশা করে।" এতবড় নাক যার—জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ তার করা মলকবৎ।

লেনিন্ বলেছিলেন বস্তুত নানা জীবনে প্রচুর সফলতা সূচিত করে ?”

বীরবল লজ্জিত হইলেও মনে মনে যুবকটির প্রতি প্রসন্নই হইল। বলিল—“আমার ত রবিবার ছাড়া সুবিধে হবে না, কারণ অন্যদিন কলেজ থাকে। তা রবিবার যে কোন সময় আপনি বলেন, যেতে পারি।”

যুবকটি বুঝিল শীকার টোপ গিলিয়াছে, মনে মনে একটু হাসিলও। অযাচিত প্রশংসা মানুষকে বশে আনিবার সর্বপ্রধান মন্ত্র তার প্রমাণ সে আরও কয়েকবার পাইয়াছে। বীরবলকে বলিল—“তা বেশ, সামনের রবিবার ভোর ৯টায় আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব। তৈরী থাকবেন। আপনার রুম নম্বরটা ?”

বীরবল রুম নম্বর বলিল। যুবক নমস্কার করিয়া যাইতে যাইতে বলিল—“দেখ্‌বেন, ঐ দিন ঐ সময় আবার ভুলে বেড়িয়ে পড়্‌বেন না যেন।”

বীরবল হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

[তিন]

বিলাত থেকে আই, সি, এস হইয়া মিহিরবরণ রায় যখন দেশে ফিরিলেন, তখন বাংলা দেশের কায়স্থ মহলে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

মিহির কুলীন কায়স্থ এবং অবিবাহিত। কন্যার পিতারা ঘটকেরা এবং আত্মীয় স্বজনেরা প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। মিহিরের

অভিভাবক স্থানীয় অন্তরঙ্গ এবং পরিচিতেরা ত নিমন্ত্রণ খাইয়া খাইয়া অজীর্ণ রোগের সৃষ্টি করিল। কিন্তু প্রজাপতির পক্ষপাত কোথায়ও ঘটিল না।

ঘটক কোন মেয়ের খবর আনিলেই মিহিরের পিতা কালীকিঙ্কর বাবু জিজ্ঞাসা করিতেন—"মেয়ের রঙ কেমন? নাক, মুখ, চোখ? ছেলে আই, সি, এস জানেন ত? মিহিরের জন্য আমি এমন মেয়ে চাই যাকে সাজালে মেম সাহেবের চেয়ে সুন্দর দেখাবে।"

ঘটক হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে সব কয়টি দাঁত বাহির করিয়া বলে—"আজ্ঞে, মেয়ে নয়ত যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা। নাক, মুখ, চোখ একেবারে নিখুঁত। রঙে মেম সাহেবকেও হার মানায়।"

কালীকিঙ্কর বাবু একটু আগ্রহান্বিত হন। ঘটককে বলেন—"তুমি আমার সঙ্গে একবার ভিতরে এস।"

ঘটককে ভিতরে নিয়া বসাইয়া সজোরে হাঁকেন—"কই গো, মিহিরের একটি সম্বন্ধ নিয়ে ঘটক এনেছে, একবার এদিকে এসো।"

মিহিরের মা সুমিত্রাদেবী আসেন। চওড়া লালপেড়ে সাড়ী পরিধানে, কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা, শুচিশুভ্র পবিত্রতা সর্বাঙ্গে। ইহাকে দেখিলে ইনি সুরূপা কি কুরূপা সে প্রশ্ন মনে আসে না। যুবতী কি প্রৌঢ়া সে প্রশ্নও জাগে না, এই কথাই শুধু মনে হয় ইনি পুণ্যের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়ী, দীপ্ত মহিমায় ইহার সর্বদেহ সমুজ্জল, দিব্য মমতায় ইহার আনন করুণাস্নিগ্ধ।

ঘটকের শির আপনা থেকে নত হয়। সুমিত্রাদেবী স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করেন—"মেয়ে গীতা পড়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত?"

ঘটক একটু অবাক হয়। যে ভাবিয়াছিল ছেলের মা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবেন মেয়ে গান বাজনা, সেলাই, এসব জানে কিনা, কতদূর

পড়েছে, ইংরাজী কিরকম বলতে পারে ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের উত্তর সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু একি প্রশ্ন?

ঘটক ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—"আজ্ঞে মা, আমিত এসব খবর জানি না। আচ্ছা: জিজ্ঞাসা করে এসে বলবো।"

মনে মনে ভাবে পাগল নয়ত?

কিন্তু আর থাকিতে সাহস পায় না! কি জানি এর পর যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন—"তুমি উপনিষৎ পড়েছ, তবেই ত গিয়েছি আর কি?"

সে সোজা প্রস্থান করে।

ঠক বাছিতে বাছিতে গাঁ উজাড় হয়, পছন্দ মত মেয়ে আর পাওয়া যায় না। সুমিত্রা দেবীর হয়তঃ কোন মেয়ে দেখিয়া খুব পছন্দ হয়। আসিয়া স্বামীকে বলেন—"দিব্যি মেয়েটি! অত্যন্ত কোমল এবং নম্রপ্রকৃতি ধর্মভয় ও আছে। আমার ত মনে হয় একে ঘরে আন্‌লে খোকার জীবন বাস্তবিক শান্তিপূর্ণ হবে।"

সব শুনিয়া কালীকিঙ্কর বাবু বলেন—"ইংরেজী কতদূর পড়েছে, গান বাজনা জানে ত? ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রীর ঘরে বসে শুধু গীতা আওড়ালে ত আর চলবেনা। একটু আপ্ টু ডেট্ স্ত্রী না হলে খোকা তাদের সমাজে মুখ দেখাবে কি করে?"

সে সম্বন্ধ ও আর অগ্রসর হয় না।

মিহির এদিকে মাদ্রাজে নিশ্চিন্তমনে হাকিমী করে। বাবা ও মা কত মেয়ে দেখিলেন বা কত মেয়ে অপছন্দে ফেরৎ গেল, কোন খবরই সে রাখে না। দুপুরে কাছারী করে, বৈকালে টেনিস খেলে, রাত্রে ক্লাবে ব্রিজের আড্ডায় যোগ দেয়।

বিলাত থাকিতে একটি মেয়ের সঙ্গে মিহিরের বেশ পরিচয় হয়—নাম মিস্ মীরা চান্দুমেয়ন্। অক্স্ফোর্ডে বি-এ পড়িত। লম্বা ছিপছিপে মেয়েটি, পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য হাবভাব, চালচলন বেশ আয়ত্ব করিয়াছে। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল, মিহিস্বরে কথা বলে, কারণে অকারণে ততোধিক মিহিস্বরে হাসে। মিঃ কান্তিলাল চান্দুমেয়ন্ ইণ্ডিয়া অফিসে বেশ বড় চাকুরী করেন, সপরিবারে বহুদিন যাবৎ লণ্ডনেই আছেন।

মিহির তাদের বাড়ীতে থাকিয়া আই, সি-এস এর জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। মিস্ চান্দুমেয়নকে মিহির মিস্ মেয়ো বলিত।

মিহির হয়তঃ কোনদিন বলিত—"আচ্ছা মিস্ মেয়ো, ভারতীয় কৃষ্টি, ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? ভারতের বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য ত ভারতের বাইরে না এলে সম্যক উপলব্ধি করা যায় না।"

মীরা কথায় যতটা সম্ভব বিলাতী সুর মিশাইয়া বলেন—"উপলব্ধি আমার খুব ভাল করেই হয়েছে। আমি ত ভেবেই পাই না, বহুশতাব্দী পূর্বের বস্তাপচা সভ্যতার উল্লেখ ভদ্র সমাজে অর্থাৎ পাশ্চাত্য সমাজে করতে আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায় না? কত হাজার বৎসর পূর্বে কোন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমাদের পূর্ব পুরুষ কি করেছিল বা কি করে নি, তাই রোমন্থন করে বর্তমান যুগে সুসভ্য জাতিদের কাছে এই যে আমাদের দৈন্য ও হীনতা ঢাকবার ব্যর্থ-প্রয়াস, এতে কি আমাদের শির আরো হেট হয় না?"

মিহির একটু ব্যঙ্গের সুরে বললেন—"তাই দেশের ঠাকুরকে হেলায় ত্যাগ করে বিদেশের কুকুরকে মাথায় করে আমরা নাচ্ছি! ফলে দেশের ঠাকুর আমাদের ত্যাগ করছে, অধিকন্তু বিদেশের কুকুরের পদাঘাত আমাদের শিরোভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

মীরা একটু উত্তেজিত ভাবে বলেন—"ঠাকুর কুকুরের এই প্রভেদই আমাদের দেশের অবনতির একটা প্রধান কারণ। গুণের আধারকে বাদ দিয়ে গুণকে আদর করতে শিখলে এরূপ নানাবিধ বৈষম্য ও বিভেদ আমাদের জাতিগত উন্নতিকে ব্যাহত করত না।"

মিহির একটু হাসিয়া বলেন—"আঁধারকে একেবারে উপেক্ষা করলেই বা চলে কি করে? মৃৎপাত্র এবং তাম্রপাত্রভেদে কি উত্তাপের তারতম্য হয় না? আপনি ত পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। উঁচুদরের পাশ্চাত্য সঙ্গীত কি আপনার এবং আমার উপর একই রকম প্রভাব বিস্তার করবে?"

মীরা ও হাসিয়া জবাব দেন—"আপনি যাই বলুন মিঃ রায়, মোটরের যুগে গরুর গাড়ী অচল হবেই। ধ্যান্ প্রাণায়াম, নিদিধ্যাসনের অজুহাতে তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে গান্ধী ও পারবে না।'

মিহির হঠাৎ উঠিয়া বলেন—"গরুর গাড়ীর যুগ আমাদের যতই গৌরবের হোক, এখন একবার মোটরের যুগে না ফিরলে কিন্তু চলছে না। আজ মিঃ সেনের ওখানে পার্টির কথা মনে আছে ত? পাঁচটা ত বাজে।"

মীরা তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলেন—"আমি এক্ষুণি আসছি মিঃ রায়। আপনি তৈরী হয়ে থাকুন, দুজনে একসঙ্গেই বেরুব।"

মিহির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অপস্রিয়মান অগ্নিশিখার দিকে চাহিয়া থাকে।

[চার]

মিহিরের আই, সি, এস পরীক্ষা আজ শেষ হইয়া গিয়াছে। ক্লান্ত মন এবং অবসন্ন দেহ নিয়া সে একটা সোফার পর গা এলাইয়া দিয়া পড়িয়া আছে। আগেই খবর পাঠাইয়াছে, ভোজন কক্ষে আজ আর সে যাইবে না। 'বয়' একপাশে খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

মিহির ভাবিতেছে। এলো মেলো কত চিন্তা তার ভারাক্রান্ত মন ও শ্রান্ত মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে। পিতা মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব, গোটা বাংলা দেশটাই তার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে। কতদিন—কতদিন পরে সে যেন একটু ভাবিবার সময় পায়। মিহিরের মন সুজলা, সুফলা বাংলামায়ের কোলে যাইবার জন্য কাঁদিয়া উঠে।

দরজায় খুঁট করিয়া একটি শব্দ হয়। মিহির ভাবিয়াই চলিয়াছে। আচ্ছা, মীরা সম্বন্ধে তার কি কোন দুর্বলতা আছে? না—নিশ্চয়ই না। একসঙ্গে থাকিলে এরকম ঘনিষ্ঠতা হইয়া থাকে, এটা দীর্ঘদিনের পরিচয় জনিত। মিহির মনকে প্রবোধ দেয়। কিন্তু যদি আর কিছু হয়? না—না—সে অসম্ভব। মিহির সবলে নিজের চিন্তার টুঁটি চাপিয়া ধরে।

দরজার কড়াটা আবার নড়িয়া ওঠে। মিহিরের চিন্তাসূত্র তাতে ছিন্ন হয় না। মিহির ভাবে—মীরার ঘনিষ্ঠতার মধ্য থেকে সে যেন কি খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে। কতদিনের কত ছিটেফোঁটা সাধারণ কথার মধ্যে যেন কোন অতলের সন্ধান করে। নিজের মনকে

আর প্রশ্ন করিতে সাহস পায় না। পরীক্ষার ফল কেউ জানিয়া আসিলে সংশয়াকুল পরীক্ষার্থী যেমন নিজের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে ভয় পায়, সেইরূপ অজ্ঞাত ভয়ে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হয়।

দরজার কড়াটা এবার একটু জোরে নড়িয়া ওঠে। গভীর রাত্রিতে নিদ্রিত শত্রু সৈন্যকে হঠাৎ আক্রমণ করিলে তাদের সমস্ত শৃঙ্খলা যেমন অতর্কিতে ভঙ্গ হইয়া তাদিগকে অতি মাত্রায় চমকিত করিয়া তোলে, মিহিরের মন ও তেমনি বিস্মিত চমকে লাফাইয়া উঠিল।

মিহির জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল—"আমি, দরজা খুলুন।"

এবার মিহিরের বিস্ময় তার বিস্ময়বোধের সীমা ছাড়াইয়া গেল। দেয়ালের ঘড়ি ও ঢং ঢং শব্দ করিল এগারো বার।

"মিস্ মেয়ন, আপনি এত রাত্রে?" ঘটনার অতর্কিততায় মিহিরের আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না।

মীরা জোরে বলিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি, দোর খুলুন। ভয় নেই, এত রাত্রে লোকজন নিয়ে ডাকাতি করতে আসিনি। বাব্বা, আপনার কি কুম্ভকর্ণের ঘুম!"

এবার মিহির মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিয়া মীরাকে বসিবার জন্য সোফাটা ছাড়িয়া দিয়া নিজে একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলিল—"আপনাকে বোধ হয় অনেকবার ডাকতে হয়েছে। কি রকম যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম তাই আপনার ডাক মোটেই শুনতে পাই নি।"

মীরা বিস্ময়ের স্বরে বলিল,—"বলেন কি, এর নাম কি অন্য-মনস্ক?

যেরকমভাবে কড়া নেড়েছিলাম, ভাগ্যিস পাড়ার লোক ছুটে আসে নি! আমি ত ভেবেছিলাম আপনি গভীর নিদ্রামগ্ন।"

মিহির বলিল—"তা, এত রাত্রে যে ব্যাপার কি?"

মীরা সোফার উপরে নিশ্চিন্তভাবে গা এলাইয়া দিয়া নির্লিপ্তভাবে বলিল—"বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম পাচ্ছিল না, তাই আপনার সঙ্গে একটু গল্প করতে এসেছি।"

মিহির ত অবাক! মিস্ মেয়নের কি মাথা খারাপ হইল না কি? এত রাত্রে একাকী তার কক্ষে?

মেয়ন্ যদি জানিতে পারেন, সে কি জবাব দেবে?

মীরা তার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—"কোন ভয় নেই আপনার মিঃ রায়। বাবা এখন শয়নকক্ষে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হ্যাঁ, তারপর পরীক্ষা কি রকম হল?"

মিহিরের বুক টিপ টিপ করে। এত রাত্রে, একাকী মিস্ মেয়নের নিবিড় সান্নিধ্য তার শরীরের সমস্ত রক্ত তোলপাড় করিয়া তোলে। সমস্ত ঘরের মধ্যে যেন তার অশরীরি উষ্ণকোমল স্পর্শ। কী এক অননুভূত আবেশে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিঃসাড় হইয়া আসে।

কোনমতে সমস্ত জড়তা সবলে মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া উত্তর দেয়—"পরীক্ষা, তা একরকম হয়ে গেছে। পাশ হয়ত করব। বিশেষতঃ পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রায় বাহাদুর এবং আমি ভারতে বা এখানে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই।"

আবার কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। অসাধারণ বাক্‌পটু ও চপলা মীরাও যেন আর কথা খুঁজিয়া পাইতেছে না।

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপচাপ থাকিবার পর মিহির হঠাৎ চোখ

তুলিতেই মীরার সঙ্গে চোখোচোখি হইল। সেই দৃষ্টিতেই যেন উভয়ের হৃদয়ের রহস্তের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল, অন্তরের অন্তরালের যবনিকা মুহূর্ত্তের জন্ত উঠিয়া গিয়া ক্ষণকাল উভয়ে উভয়ের মনের সন্ধান পাইল।

মিহির শুধু উঠিয়া গিয়া সোফার গায়ে এলায়িত মীরার ডান হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া গভীর আবেগে চুম্বন করিল।

তারপর আবার দু'জনেই নিশ্চুপ।

মিহির শুধু কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"এত সৌভাগ্য, এত গভীর সৌভাগ্য, এত নিবিড় সৌভাগ্য আমার সহ্য হবে কি? সমগ্র পৃথিবী আজ তোমার কাছে অতি মাত্রায় তুচ্ছ, অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়ে গেছে।"

মীরা স্নেহ কোমল কণ্ঠে বলিল—"মিহির, আমারও মন থেকে আজ এক গুরুভার নেমে গেছে। তুমি ত জান, আমি ভারতের লজ্জাবনতা মনোভাব প্রকাশে অসমর্থা তরুণী নই। তবু তোমার কাছে কিছুতেই মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছিলাম না। এ নিয়ে অস্বস্তিও আমাকে কম ভুগতে হয় নি।"

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। মিস্ মেয়ন বলিল—"আমি এখন চললাম মিহির। এর পরের ব্যবস্থার ভার কিন্তু তোমার। বাবাকে আমি এসব কথা কিছুতেই বলতে পারব না।"

মীরার গমনরতা মূর্তির দিকে চাহিয়া মিহির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

[পাঁচ]

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মিহির এখন মাদ্রাজে ম্যাজিস্ট্রেট। মীরাকে সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। সাড়ে তিন বৎসর পূর্বে মিস্ মেয়নের কাছ থেকে বিদায় নিতে যে মিহিরের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছিল, জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনে হইয়াছিল, সে মিহিরকে এই মিহির এখন আর চিনিবে না। অথচ তখনও সে মীরাকে আশ্বাস দিয়াছিল ভারতে যাইয়াই মিঃ মেয়নকে সে চিঠি দিবে তার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিয়া। প্রথম প্রথম চিঠিপত্র খুবই চলিত, তারপর আস্তে আস্তে আপনা থেকেই কমিয়া আসিয়া শেষে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বৈকালে বেড়াইতে যাইয়া মিহিরের নেহাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মীরার সঙ্গে দেখা। মীরা আনন্দে হাত তালি দিয়া উঠিল। সেই রকম চটুলা, সেই রকম পরিহাস রসিকা, যৌবনের উন্মাদনা আসিয়াছে কিন্তু সঙ্কোচ আসে নাই। দেহের কানায় কানায় তরঙ্গভঙ্গের উচ্ছলতা, গতিবেগের চাঞ্চল্য, কিন্তু লজ্জাজনিত জড়তা বস্ত্রস্তূপের অন্তরালে যৌবনকে ঢাকিবার সসঙ্কোচ প্রয়াস পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়তা করে না।

মিহির আনন্দে ফাটিয়া পড়ে। অপরিসীম খুসীতে ঝলমল করিতে করিতে বলে—"মিঃ মেয়ন, আপনি এখানে? এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! কি আশ্চর্য! আপনাদের দেখে যে কি আনন্দই হচ্ছে।"

মিঃ মেয়ন স্নেহের সুরে বলেন—"মিহিরই ত দেখছি, তোমাকে যে এখানে দেখব এও একেবারে অভাবিত! তুমি কি এখানেই পোস্টেড্?"

মিহির বলিল—"হ্যাঁ, মিঃ মেয়ন, আমি প্রায় ছয় মাস যাবত এখানেই আছি। তা আপনি কি ছুটীতে এসেছেন না কোন কাজ আছে? কিছুদিন এখানে থাকবেন ত?"

মীরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘাড়টা একটু দোলাইয়া বলিল—"মিঃ রায় দেখছি দেশে এসে সব ভুলে গেছেন। আপনি থাকতে থাকতেই ত পপির রিটায়ার করবার সময় প্রায় হয়ে এসেছিল।"

মিহির বলিল—"তাই কি আপনি রিটায়ার করে দেশে এসেছেন? আমি ত ভেবেছিলাম আপনি ওখানেই থাকবেন। সমস্ত জীবন ওদেশে কাটিয়ে তারপর দেশ কি আর আপনার ভাল লাগবে?"

মীরা বলিল—"দেখুন ত মিঃ রায় আমি পপিকে এত বল্‌ছি যে দেশে যেয়ো না, সেথানকার আকাশ বাতাস পর্যন্ত এত একঘেঁয়ে যে দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠ্‌বে। তা পপি কিছুতেই শুনলে না। আমার ত এদেশে একদণ্ডও ভাল লাগে না।"

মিঃ মেয়ন হাসিয়া বলিলেন—"বুঝেছ মিহির, ওদেশে থেকে ডলি একেবারে মেমসাহেব বনে গেছে। দেশের কিছুই আর ওর ভাল লাগে না।"

মিঃ মেয়ন একটু মনে মনে হাসিলেন। মীরার জন্যই তার দেশে আসা। একমাত্র আদরিনী মেয়ের বিষন্ন মুখখানি তার বুকে গভীর শেলাঘাত করিত।

মিহির চলিয়া যাইবার পর মীরা আর বেশী দিন নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে পারে নাই। স্নেহময় পিতার মমতা কোমল স্পর্শে মাতৃহীনা কন্যা নিজের অন্তরের রহস্য কখন নিজের অজ্ঞাতেই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিয়াছে।

মিহির বিলাত থাকিতে একথা জানিতে পারিলে অবশ্য সেখানেই তার মীমাংসা হইত। কিন্তু মিহির তখন বহুদূরে।

মিঃ মেয়ন কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তাই শুধু মেয়ের মুখ চাহিয়াই তাকে ভারতে আসিতে হইয়াছে মিহিরের সন্ধানে।

মিহিরকে এখানে তারা প্রত্যাশা করে নাই। এত সহজে, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তার সন্ধান পাইয়া তাই উভয়েই উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভরপুর।

মিঃ মেয়ন এজন্যই বলিয়াছিলেন। ভাবিলেন—বিধাতা নারীর মন কি দুর্জ্ঞেয় রহস্যেই না আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। মিহিরকে পাবার জন্য মীরার সমস্ত চিত্ত উদ্‌গ্রীব ও ব্যাকুল অথচ মুখে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব।

মীরা হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা পপি, তোমারই কি ভাল লাগে। যখন আত্মীয়স্বজনেরা তোমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খায় না। নিরক্ষর অসভ্য যারা তাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু যখন দেখি য়ুনিভারসিটির কোন প্রফেসর, কোন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা কোন জজ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে এক টেবিলে চা খেতে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়, তখনও এদেশের শিক্ষিতদের উপর ভাল ধারণা রাখা কি উপযুক্ত মনে কর ?"

পিতৃস্নেহে ভরপুর মীরার হৃদয়ের এক অনুদ্‌ঘাটিত দিক হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিল।

মিঃ মেয়ন ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া শান্ত-কণ্ঠে বলিলেন—"এতদিন ঐদেশে কাটিয়ে আমার কিন্তু এই বিশ্বাসই দৃঢ়তর হয়েছে যে ওদেশের সব নির্বিচারে ভাল এবং আমাদের দেশের সব নির্বিচারে মন্দ, এই ভাব বদ্‌লাবার আমাদের দিন এসেছে। যাক্, রাস্তায় দাঁড়িয়ে

এধরণের তর্ক আরম্ভ করলে পথচারীরা কিন্তু আমাদের আর যাই ভাবুক সুস্থ ভাববে না। মিহির, আজ সন্ধ্যায়ই আমাদের ওখানে তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। যেতে ভুলো না কিন্তু।"

মিঃ মেয়ন নামধামসহ একখানা কার্ড মিহিরকে দিলেন। মিহির মিঃ মেয়নকে নমস্কার করিয়া মীরার দিকে তাকাইয়া বিদায়ের ভঙ্গীতে বলিল—"তবে আসি, মিস্ মেয়ন।"

মীরা কোন কথা না বলিয়া মিহিরের দিকে শুধু তাকাইল। সে চাহনীতে ছিল অনুরোধ, তাতে ছিল অভিযোগ, ভালবাসার সলজ্জ প্রকাশের অস্পষ্টতা, নিজের মাধুরী উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিবার মধুর চেষ্টা!

তারপর ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া গমন রত পিতাকে অনুসরণ করিল।

[ছয়]

মহাযুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যেমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি তার ছোঁয়াচ অল্প বিস্তর সমগ্র সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানের মূলই আলোড়িত করিয়াছিল। ভোটাধিকার যে পত্নীর প্রতি স্বামীর অধিকারের মত স্বতঃলব্ধ জিনিষ, এসম্বন্ধে অতি সাধারণ লোকও সজ্ঞান ছিল। তাই অত্যন্ত নগণ্য কোন ক্লাব ও সমিতির নির্বাচন ব্যাপারেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা বিলাতের পার্লামেণ্টের সভ্য নির্বাচনের সমস্ত খানি হৈ চৈ যথাসম্ভব

করিয়া নিজেদের পথ মিটাইবার চেষ্টা কোথাও কম দেখা যাইত না। বড় বড় নির্বাচন ব্যাপারের সমস্ত জটিলতা ও নীচতা শিক্ষার গোড়া-পত্তন অবশ্য এই ভাবেই আরম্ভ হইল।

জগন্নাথ কলেজেও নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচন হইবে কলেজের বিভিন্ন ক্রীড়া ও প্রমোদ বিভাগের সম্পাদক বা কর্মকর্তা। কলেজ ও তৎসংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস সমূহে ভীষণ উত্তেজনা! বিভিন্ন পদপ্রার্থীর জন্য বৈধ, অবৈধ, সহিংস, অহিংস প্রভৃতি যত প্রকার ব্যবস্থা বড় বড় নির্বাচনে নেতাদের বেলায় অনুসৃত হয়, তার কোনটাই বাদ যায় নাই। পোষ্টার, হাণ্ডবিল, পার্টিমিটিং, গালাগালি, মিথ্যা-নিন্দা অবাধে চলিতেছে।

বীরবলের পক্ষে এত গোলমাল, হৈ চৈ, একটু অতিরিক্ত মনে হইতেছিল। স্কুল জীবনে, বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ে যে ধরণের হৈ চৈ'র মধ্যে সে বর্ধিত হইয়াছে, তাহা একটু বিভিন্ন রকমের। তাহা ছিল নির্দোষ, স্বার্থগন্ধহীন আমোদের বিশুদ্ধ ও অনাবিল প্রকাশ। আধুনিক সভ্যতার ক্লেদাক্ত পঙ্কিলতা সেখানে তখনও প্রবেশ লাভ করে নাই, যে শুচিশুভ্র পরিবেশ পল্লীজীবনের শান্ত, সমাহিত বিশুদ্ধতার জন্য দায়ী, তাহা ভদ্রবেশী বর্বরতার বিষাক্ত আবহাওয়ায় কলুষিত হইয়া উঠে নাই।

পাড়াগাঁয়ের স্বভাবসিদ্ধ শান্তি ও অনাবিলতার মধ্যে বর্ধিত হওয়ায় সহরের এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন আবেষ্টনীতে সে নিজেকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিল না। তাই কলেজ জীবনের প্রারম্ভে এতদিন বীরবল যেন তলাইয়া ছিল। নেতৃত্বের সহজলব্ধ ক্ষমতা, তার জীবনের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক গতি যেন কোথায় বাধা পাইতেছিল। কচ্ছপ যেমন বাহিরের কোন স্পর্শ পাইলে শরীরের ভিতর তার হাত পা

গুটাইয়া ফেলে, সহরের কোলাহলময় অকারণ ব্যস্ততার স্পর্শও তেমনি তার সমস্ত স্বাভাবিক কর্মশক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিল।

সেদিন ব্যাপ্‌টিষ্ট্‌ মিশনের কমন রুমে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের মিটিং। বিষয়—কলেজের আগামী নির্বাচন। কলেজ... হোষ্টেল, অক্‌স্‌ফোর্ড মিশন হোষ্টেল এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসের সমস্ত প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা আসিয়াছে। ভীষণ হৈ চৈ। পাড়াগাঁয়ে স্কুল থেকে পাশ করা ছেলেরা একদিকে বসিল, সহরের ছেলেরা অন্যদিকে। প্রত্যেকেই পার্শ্বোপবিষ্ট সহপাঠীর সহিত আলাপে ব্যস্ত।

একটি ছেলে উঠিয়া টেবিলের উপর দাঁড়াইতেই সকলে নিশ্চুপ। সাধারণ বক্তৃতামঞ্চে যে ভাবে বক্তৃতা হয়, সেভাবে চারিদিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিতে লাগিল—বন্ধুগণ! কলেজ নির্বাচন আসন্নপ্রায়। এতকাল ধরে চলে আসছে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরাই সব ব্যাপারে মোড়লি করে। বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা তারাই হয়, সমস্তপ্রকার আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়া প্রভৃতি ব্যাপারে তারাই সর্বেসর্বা। কিন্তু এ চলবে না! প্রাচীনতা ও প্রবীনতা এক জিনিষ নয়। আগে এলেই যদি আগের অধিকার জন্মে, তবে পৃথিবীর পরিবর্ত্তন হোতো না, অনার্যদের তাড়িয়ে আর্য আসতে পারত না, হিন্দুদের পরাজিত করে মুস্‌লিম-রাজ্য গড়ে উঠ্‌ত না, মুস্‌লিম গিয়ে বৃটিশ-রাজ্য স্থাপিত হোতো না।"

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে বেশ উত্তেজনা দেখা দিল। বুঝা গেল তারা সবাই বক্তার যুক্তি মানিয়া নিয়াছে। বেশ একটা মৃদু অথচ সুস্পষ্ট উত্তেজিত গুঞ্জন উঠিল।

বক্তা সমর্থন পাইয়া দ্বিগুন উৎসাহে বলিতে লাগিল—"ভাই সব, এস আমরা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের স্পর্ধিত দাবী অস্বীকার

করি। আমাদের মধ্যে কি মানুষ নেই? তারা যা পারে আমরা কি তা পারি না? নিশ্চয়ই পারি। আমি জোর করে বলতে পারি আমাদের মধ্যে যারাই নির্বাচিত হবে, তারাই সুষ্ঠুভাবে এ কাজ চালাতে পারবে।"

বক্তা থামিল; তারপর কি ভাবিয়া আবার বলিল—"আমি অনেকক্ষণ বললাম। জানি না আপনাদের আমার মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরেছি কি না। তবে আমার খুবই ইচ্ছা যে পাড়াগাঁ থেকে যারা এসে কলেজে ভর্তি হয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে কেউ দাঁড়িয়ে দু' একটা কথা বলুন। তাতে আমরাও তাঁদের মনের ভাব বুঝতে পারব, অন্যান্য যারা পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন, তাদেরও হয়ত কথাগুলি মনে বেশী লাগবে।"

বক্তা বসিয়া পড়িল। ছেলেদের মধ্যে একটা ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল। এ ওকে ঠেলে, এ ওকে ঠেলে। কিন্তু কেউ দাঁড়াতে সাহস পায় না। হোলই বা নিজেদের মধ্যে, তবুও ত বক্তৃতা। দু' একজনের বুক তখনই ঢিপঢিপ করিতে লাগিল।

বীরবল ছিল সকলের পিছনে চুপচাপ বসিয়া। কাহারও সহিত কোন আলোচনাই সে এ বিষয়ে করে নাই। হঠাৎ অনেকের দৃষ্টি তার উপর পড়িল। তার উপর বলিলে ভুল হইবে; তার অত্যুগ্র নাসার উপর যে অনেকের দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। অনেকেরই মনে এই ভাব, অত বড় নাসিকা যার তাকে কিছু বলিতেই হইবে। পাড়াগাঁ থেকে আগত ছেলেরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পিছন থেকে বেশী ঠেলাঠেলিতে যাদের মুখ চোখ লাল, শরীর ঘর্মাক্ত ও বুক ঢিপঢিপ করিতেছিল, তারা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

বীরবলকে কিছু বলিতেই হইবে।

বীরবল আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল—"আমি ত আপনাদের এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, কখনো ভাবিনিও, আমি কি বলব? তা ছাড়া আমার অভ্যাস একেবারেই নেই।"

কেউ শুনিল না। বীরবলকে দাঁড়াইতেই হইবে। ভাবটা যেন এই যদি বক্তৃতা দিতে না-ই পারিবে, তবে অত বড় নাসিকা আছে কেন?

বীরবল দাঁড়াইল, পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের বুক আবার ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। কিন্তু এবার ভিন্ন কারণে, কি জানি যদি ঘাব্‌ড়াইয়া যায়, যদি কিছু বলিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ তো—তো—তো করিয়া বসিয়া পড়ে। এম্‌নি ত তাকে একটু মুখচোরাই মনে হয়।

সেওড়া গাছে ভূত আছে এটা জানা থাকিলেই গভীর রাত্রিতে সেওড়াতলা দিয়া যাইতে গা ছম ছম করে। কিন্তু যে জানে না তার কাছে সেওড়াতলা আর আমড়াতলা একই কথা।

বীরবল ও বিচলিত হইল না। কোনরকম ভূমিকা না করিয়াই সে অকম্পিত কণ্ঠে বলিল—"আমার সহপাঠীরা! কলেজের এ সব নির্বাচন ব্যাপারের সহিত আপনাদের কারও কারও মত আমার এই প্রথম পরিচয়। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরাই বা আমাদের কতখানি কি অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং আমরাই বা কতটা অপমানিত বা অবহেলিত হয়েছি তা-ও আমি ভেবে দেখিনি। তবে আমি পাড়া গাঁয়ে পোষিত ও বর্ধিত। আমি শুধু এইটুকু বুঝি অধিকার রক্ষায় যদি ভেদনীতির সাহায্য নিতে হয় তবে সে অধিকার ইষ্টের চেয়ে অনিষ্ট বেশী হয়।"

বীরবল থামিল। বোধ হয় আর কি বলিবে তাহা ভাবিবার

জন্য। অথবা তার কথায় শ্রোতাদের মনে কি ভাব হয়, তাহা দেখিবার জন্য তারা নিজের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই চমকিত হইল। সে যে এতগুলি ছেলের সামনে এরকম ভাবে বলিতে পারে একটু ও ইতস্ততঃ না করিয়া, একটুও না ঘাব্‌ড়াইয়া, এতে নিজের উপর তার শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গেল।

সে বলিতে লাগিল—"আপনারা হয়ত বলবেন এই শান্তিপ্রয়াস, কোনরূপ গোলমালের ভয়ে এই নিশ্চেষ্ট নীরবতাই সমস্ত জাতিকে অধঃপতনের দিকে টেনে নামাচ্ছে। মৃত্যুতে যে শান্তি মানবদেহের উপর আসে, রোগযন্ত্রনায় ছটফট করার অশান্তি তার চেয়ে অনেক ভাল। এ বিষয় আমি কোনদিন ভেবে দেখিনি। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, তা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার শুধু এইটুকু মনে হয় গোলমালের সৃষ্টি না করে যদি চলা যায়, সেটাই বাঞ্ছনীয়। তবে এটুকু ও আপনাদের অকপটে জানাচ্ছি, আপনারা সকলে মিলে যা সাব্যস্ত করবেন, আমি তাতে অমত করব না।"

বীরবল থামিল। অত্যন্ত অনায়াসে এবং অত্যন্ত সহজ ভাবে তার বক্তব্য বলিয়া সে থামিল। টেবিল থেকে নামিয়া আসিতেই সকলের সমবেত ধন্যবাদ ও বাহবা তাকে প্লাবিত করিয়া দিল।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। নির্বাচিত সমস্তগুলি পদই প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা অধিকার করিল, কারণ সংখ্যায় তারা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেনীর ছাত্রদের চেয়ে অনেক বেশী। বিশেষতঃ রক্ষা কবচের দাবী তখন ও সেখানে উঠে নাই। বীরবল হইল সাধারণ সম্পাদক।

[সাত]

মিহির ঠিক সময়েই মিঃ মেয়নের বাড়ীতে উপস্থিত। গাড়ী ভিতরে ঢুকিতেই মীরা ছুটিয়া আসিয়া মিহিরকে নিয়া ড্রয়িংরুমে বসাইল।

মিহির জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার বাবা কোথায়?"

মীরা বলি—"তিনি একটু বিশেষ জরুরী কাজে বাইরে গেছেন, এক্ষুণি আসবেন।"

মিহির দেখিল মীরা একটু লম্বা, একটু রোগা হইয়াছে। জলবায়ুর জন্ত রঙটা একটু ময়লা দেখাইলেও উগ্রতাটা যেন একটু স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। মুখে বিষাদের কালিমা।

মীরা দেখিল মিহির আরও স্বাস্থ্যবান্, আরও সুন্দর হইয়াছে। উচ্চপদ লাভের মর্যাদাবোধ তার সর্বাঙ্গে একটা সম্ভ্রমের ছাপ দিয়াছে।

দু'জনেই নীরব। উভয়েই যেন প্রাণ ভরিয়া উভয়ের এই নীরব সান্নিধ্য উপভোগ করিতে লাগিল। কথা কহিয়া এই অপরূপ মোহময় আবেষ্টনীকে আঘাত দিতে কেহই চাহিল না।

মিহির ভাবিতেছিল সুদীর্ঘ পাঁচবৎসর পূর্বেকার এক রজনীর কথা। তখনও দু'জনে কথা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এক অপূর্ব নিবিড় পুলকে উভয়ে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর—মিহির সবলে সে চিন্তাকে মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিল।

কি হইবে সে কথা ভাবিয়া? কি হইবে শূন্যে সৌধ নির্মানের

স্বপ্ন দেখিয়া ? মিহির ত ভালভাবেই জানে তার মা এরূপ বিবাহ পছন্দ করিবেন না। সেই জন্যইত সে মীরাকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছে, চিঠি দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিয়াছে।

মীরা ভাবিতেছিল, তার দুর্ভাগ্যের কথা। মিহির তাকে ভুলিয়া গিয়াছে ! যে মিহির বিলাতে থাকিতে তাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে চাহিত না, সে গত এক বৎসর যাবৎ তাকে একখানা চিঠি পর্যন্ত দেয় নাই। অভিমানে তার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। মীরা কিছুতেই নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিল না।

মিহির তাকাইয়া দেখিল মীরা কাঁদিতেছে। সোফার উপর গা এলাইয়া দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

মিহির কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না। উঠিয়া রুমাল দিয়া তার চোখ মুছাইয়া দিবে, কোলের উপর মাথাটি রাখিয়া একটু সান্ত্বনা দিবে, একটু আদর করিবে ?

মীরার কান্না বাড়িয়াই চলিয়াছে। না—মিহির অতটা নিষ্ঠুর কিছুতেই হইতে পারে না। যাক তার সংযমের বাঁধ টুটিয়া, যাক তার এতদিনের কঠোর সাধনা নিষ্ফল হইয়া। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া মীরার পাশে বসিল, আস্তে আস্তে তার মাথাটি কোলে নিতেই জীর্ণ ইষ্টকস্তূপের মত সে মিহিরের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

একখানা মোটর ভিতরে প্রবেশ করতেই দু'জনে চম্‌কাইয়া উঠিল। মিঃ মেয়ন গাড়ী থেকে ব্যস্তভাবে নামিলেন। মীরা তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল নিজেকে একটু সাম্‌লাইতে, অশ্রুর বিলুপ্তপ্রায় রেখা অবলুপ্ত করিতে। মিহির অন্য কিছুর অভাবে একটা বন্দুকের ক্যাটালগের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

মিঃ মেয়ন সটান ড্রয়িংরুমে; ঢুকিয়াই বলিলেন—"ভেরি সরি

মিহির, আমার একটু লেট হয়ে গেছে। (হাতঘড়ির দিকে তাকাইয়া) কোন একটা বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল। তা তুমি কতক্ষণ?"

মিহির বিনীতভাবে বলিল—"আজ্ঞে, আমি এই অল্পক্ষণ এসেছি।"

মিঃ মেয়ন—"ডলি কোথায়? তুমি যে একা একা বসে আছ? তাকে খবর দিলেই ত পারতে?"

মিহির—"তিনি এতক্ষণ আমার সঙ্গেই গল্প করছিলেন। এই একটু আগে কি একটা কাজে ভেতরে গেছেন।"

মিঃ মেয়নের মুখে তৃপ্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বাংলার বহু সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়ের ধনী পিতার মত তিনিও মিহির সম্বন্ধে একটু আশা পোষণ করিতেন।

চায়ের টেবিলে মিহির আবার পাঁচবৎসর পূর্ব্বেকার মেয়েকে ফিরিয়া পাইল। তেমনি চটুলা, তেমনি কলহাস্যময়ী, তেমনি অধীরা। মিঃ মেয়নও যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁর পূর্বজীবন ফিরিয়া পাইলেন।

তিনদিন পরে আবার সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়া মিহির বিদায় নিল। মিঃ মেয়নের আন্তরিকতা ও মীরার সরল ও নীরব মিনতি তাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিল।

গাড়িতে বসিয়া মিহির ভাবিতে লাগিল। মীরা তবে তাহাকে এখনো ভালবাসে! সুদীর্ঘ পাঁচবৎসরে সে প্রায় ভুলিয়াছিল, মীরা ভোলে নাই। কিন্তু এর পরিণাম? মা কিছুতেই রাজী হইবেন না। তিনি বলিবেন কেন নিজের দেশে স্বজাতীয়ের মধ্যে কি মেয়ে নাই? মা—করুণাময়ী স্নেহময়ী মা—মার কথা মনে হইতেই মিহির যেন তার দশ বৎসর আগেকার জীবন ফিরিয়া গেল। মনে মনে সে

বহুবার আওড়াইল মা, মা, মা। শান্তির এক অনহুভূত প্রলেপে তার সমস্ত শরীর মন স্নিগ্ধ হইয়া গেল। বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত ভুলিয়া অতীতের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া দিল।

গাড়ী যে কখন আসিয়া বাসায় পৌঁছিয়াছে মিহিরের সে খেয়াল নাই। শুচিস্মিতা, স্নেহক্ষরিতনয়না জননীর শান্তশুভ্র আনন ছবি সমগ্র বিশ্বকে অবলুপ্ত করিয়া দেয়। ড্রাইভারের ডাকে চমক ভাঙ্গে। মিহির টলিতে টলিতে বাসায় ঢোকে।

[আট]

মিহিরের পিতা কালীকিঙ্করবাবু হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাংলাদেশে বিবাহযোগ্যা মেয়ে বোধহয় আর বাদ নাই। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সম্মিলিত পছন্দের পরীক্ষায় কেউ পাশ করিতে পারে না।

অথচ মিহিরের সঙ্গে মিস্ মীরা মেয়নের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার কথা তাদেরও কানে আসিয়াছে।

এবার তারা দু'জনেই পাশের নম্বর একটু কমাইয়া দিলেন—অর্থাৎ কালীকিঙ্করবাবু বলিলেন—"আচ্ছা খাটি মেমসাহেব যদি না—ই পাওয়া যায় তবে আমাদেরই লিখিয়ে পড়িয়ে উপযুক্ত করে নিতে হবে।"

সুমিত্রাদেবী বলিলেন—"ধর্মের প্রেরণা আজকালকার দিনে নিশ্চয়ই লোপ পেয়ে গেছে। মেয়েটি সুশীলা এবং সৎস্বভাবা হলেই চলবে।"

নূতন উদ্যমে আবার ঘটক লাগানো হইল।

একটি মেয়েকে সুমিত্রাদেবীর খুব পছন্দ হইয়াছে। সুন্দর রঙ,

নাকমুখের দিব্যি গড়ন, চোখ দুটি খুবই স্নিগ্ধ এবং শান্ত। বিশেষতঃ সে সুমিত্রাদেবীকে পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিয়াছে।

মেয়েটি হালফ্যাসানের কায়দাকানুনে খুব রপ্ত না হইলেও আধুনিক শিক্ষা কতকটা লাভ করিয়াছে। এই মাত্র সবে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। অল্পশিক্ষার ভয়াবহতা অথবা উচ্চশিক্ষার উগ্রতা কোনটারই প্রভাব বিশেষ না পড়ায় তার সমগ্র মুখশ্রীতে একটি শান্ত সুকোমল দীপ্তি বিরাজিত।

কালীকিঙ্করবাবুর মনও একটু ঝুকিয়াছে। মেয়েটির ইংরেজী উচ্চারণ খুব বিশুদ্ধ এবং সে পিয়ানো বাজাইতে পারে।

মেয়ের পিতা বনবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কন্‌সারভেটর। মোটর, পিয়ানো, রেডিওসেট, একটি মাত্র মেয়ের বিয়েতে ম্যাজিষ্ট্রেটের উপযুক্ত যৌতুকই দিবে, কালীকিঙ্করবাবুর এদিকেও কিছু বলিবার নাই। তিনি যা আশা করেন, তার চেয়ে অনেক বেশী পাওয়া যাইবে ইহা তিনি বুঝিয়াছেন। এখন মিহিরের পছন্দ হইলেই হয়।

সেইদিনই তিনি মিহিরকে টেলীগ্রাম করিলেন—"Bride selected, come for final selection!"

* * * *

মিহির মিঃ মেয়নের বাড়ীর চায়ের নিমন্ত্রণ এড়াইতে পারে নাই। মিঃ মেয়ন ও মীরার অনুরোধ এত সনির্বন্ধ ও আন্তরিক যে প্রত্যাখ্যান করিবার মত রূঢ়তা মিহিরের পক্ষে অসম্ভব। মনের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবশেষে সে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে আর সে পারে না। যাক্ সে অদৃষ্টস্রোতে ভাসিয়া, ভাগ্যের অমোঘ বিধানে তলাইয়া, জীবনতরী উজানস্রোতে সে আর চালাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবে না।

এ কয়দিন ধরিয়া মিহির যেন আবার মেয়ন পরিবারের সেবা যত্ন ও আন্তরিকতায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছে—কুণ্ঠাহীন, সঙ্কোচহীন, ভাবনাহীন নৈকট্যনিবিড়তায় পূত, গভীরতায় অনাবিল, দ্বিধাহীনতায় প্রাণবন্ত!

মিঃ মেয়নের মনে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে।

মিহিরের বৈকালিক চা পান এখন প্রত্যহই মিঃ মেয়নের বাড়ীতে হয়। স্রোতের জল বাঁধ দিয়া আটকাইয়া রাখা অনেক সময়েই হয়ত সম্ভব, কিন্তু সেই বাঁধ একবার ভাঙিলে আবদ্ধ জলস্রোত উদ্দমে উন্মত্ততায় দুকূল প্লাবিত করিয়া ফেলে। মিহিরের সংযত বাসনার উচ্ছলতা বাধাহীন হইয়া এখন তাহার সমগ্রচিত্তকে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

মিঃ মেয়নেরও এখন বৈকালিক চা পানের সময় প্রায়ই বিশেষ জরুরী কাজ পড়ে। কাজ যে কি তাহা মীরাও বোঝে, মিহিরও বোঝে; দুজনেই মনে মনে হাসে এবং মিঃ মেয়নের উপর কৃতজ্ঞ হয়।

সেদিন মিহির নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে আসিয়া উপস্থিত। দেখে মীরা নিবিষ্টমনে ছোটদের পাঠ্য একখানা বাংলা বই পড়িতেছে। এক মুহূর্তে মিহিরের মন অপূর্ব স্নেহে, মমতায় ও ভালবাসায় ভরিয়া উঠে। হিমালয় দুহিতা উমার পতিলাভের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার কথা মনে পড়ে।

মিহির নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দেয়। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই নারী তিলে তিলে পলে পলে জীবনের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়া তাহাকে কী ভালবাসিয়া আসিয়াছে, কী কঠোর ও দুঃসহ সাধনায় নিজকে তার মনোমত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। তার অনেক খবরই হয়তঃ সে রাখে না ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, প্রীতিতে তার মনের সর্বাঙ্গ

সিক্ত হয়, এক অনমুভূত আবেশে মাথা আপনা থেকেই নত হয়, এক সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে তার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠে।

কুমারী গৌরীর এই দুশ্চর তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে তার সাহস হয় না, এই শুচিশুভ্র পরিবেশের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত অযোগ্য, অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। আস্তে আস্তে সে সরিয়া পড়ে।

মিহির উদ্ভ্রান্তভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। মীরা বাংলা শিখিতেছে! তার সুযোগ্যা সহধর্মিণী হইবার জন্ম তার এই প্রয়াস। আর সে—এই নারীকেই অবজ্ঞা করিয়াছে, এই মহিয়সী মহিলাকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছে!

কিছুক্ষণ আত্মভোলাভাবে রাস্তায় ঘুরিয়া মিহির ফিরিয়া আসে। দেখে মীরা তার জন্ম অপেক্ষা করিতেছে চোখে প্রতীক্ষা, মুখে নীরব ব্যগ্রতা, হৃদয়ে হয়তঃ সজল অর্ঘ্য!

এক মুহূর্ত্তে তার হৃদয় ও মন সিক্ত হয়, স্নেহ ও ভালবাসার এক অপূর্ব অনুভূতি সমগ্র চেতনাকে আবিষ্ট করে।

মিহিরকে দেখিয়াই মীরা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

কলকণ্ঠে বলে—"বেশ লোক ত আপনি! পাঁচটায় আসবার কথা, এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। আমি কতক্ষণ থেকে আশায় আশায় বসে আছি।"

মিহির একটু চমকিত হইয়া ঘড়ীর দিকে তাকায়। তাই ত সাড়ে পাঁচটাইত বাজে। প্রায় দেড় ঘন্টা সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে!

কি কৈফিয়ৎ দিবে ভাবিয়া পায় না। কথাটার মোড় ফিরাইয়া বলে—"আপনি সত্যি আমার জন্ম প্রতীক্ষা করছিলেন?" মিহিরের চোখে মুখে ভালবাসার ছাপ নিবিড় হইয়া আসে।

মীরা কথাটা বলিয়া ফেলিয়া একটু লজ্জিত হয়। তাড়াতাড়ি সাম্‌লাইয়া নিয়া বলে,—"অপেক্ষা করব না? পাঁচটায় যার আসার কথা সে সাড়ে পাঁচটায় আস্‌লে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি?"

মিহির একটু অনুতপ্তস্বরে বলে—"আমি খুবই দুঃখিত মীরা দেবী, এবারকার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।"

মীরার পরিহাস ঘনাইয়া উঠে, বলে—"ক্ষমা কি এত সহজে করা যায়। ক্ষমা করতে পারি শুধু এক সর্ত্তে।"

মিহির ঘাব্‌ড়াইয়া যায়। তবু সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করে—"কি?"

মীরা হাসিয়া বলে—"যদি আমাকে 'মীরা দেবী', 'আপনি', প্রভৃতি গুরুগম্ভীর সম্মানজনক সম্বোধন না করে শুধু 'মীরা' বলেন।"

বলা বাহুল্য মীরার অনুরোধে কিছুদিন ধরিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা বাংলাতেই চলিতেছে।

মিহির মনে মনে পুলকিত হয়। হাসিয়া বলে—"ও, এই। আমি ভেবেছিলাম, না জানি কি।"

বহুদিন পূর্বের বিলাতের এক রাত্রির দৃশ্য উভয়ের মনেই চকিতের জন্য জাগিয়া উঠে।

মিহির বলে—"কিন্তু আমারও একটা নিবেদন আছে এবং এ বিষয়ে আমার বহু পূর্বের একটা নজীরও আছে।"

মীরার মন সুখস্মৃতির পুলকে রাঙা হইয়া উঠে। মনে পড়িয়া যায় সে রাত্রিতে সে আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই।

নিজেকে সাম্‌লাইয়া নিয়া প্রশ্ন করে—"কি?"

মিহির হাসিয়া বলে—"আমারও বাপ মায়ের দেওয়া একটা নাম

আছে, এবং যাতে লোকে সেটা ব্যবহার করে, একজই তারা সেই নামটা রেখেছিলেন।"

মীরার মনে পড়ে সেই রাত্রিতে 'মিহির' এবং 'তুমি' এই দুটা কথাই সে খুব সহজে বলতে পেরেছিল।

মীরা বলে—"বেশ, আপনি আগে ডাকুন।"

মিহির বলে—"না, আপনি আগে। Ladies first".

মীরা বলে—"Ladies first মানে লেডীদের আগে ডাকতে হবে।"

মিহির হাসিয়া বলে—"আমিও তাই বলছি।"

কথাটা দ্ব্যর্থবোধক হওয়ায় দু'জনেই হাসিয়া উঠে।

এরূপ কথা কাটাকাটির ভিতর দিয়া সন্ধ্যাটা দু'জনের নিকটই মনোরম হইয়া উঠে।

অবশেষে মিহির বলে—"বেশ আমিই বলছি। মীরা, একটু চা দিন না?"

মীরা সশব্দে হাসিয়া উঠে। বলে—"ওঃ, এই বুঝি আপনার বলা। বিলেত গিয়ে বাংলাটাও দেখছি একেবারেই ভুলে গেছেন।"

মিহির বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হয়। অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলে—"মীরা, একটু চা দাও না?"

বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের কর্ণেই মধু বর্ষিত হয়। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এই সামান্য কথা কয়টির মধুরতা উপভোগ করে। এবার মিহির মীরার দিকে তাকায়। মীরার কণ্ঠ আশ্চর্যরকম শান্ত ও মৃদু শুনায়। ধীরে ধীরে শুধু বলে—"মিহির।"

মীরা আর কোন কথা খুঁজিয়া পায় না, খুঁজিবার বুঝি প্রয়োজনও নাই। 'মিহির' মীরার কণ্ঠোচ্চারিত এই তিনটি অক্ষর বামনের ত্রিপাদ ব্যাপ্তির মত মিহিরের ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে।

তার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সম্যকরূপে আচ্ছন্ন করিয়া [illegible] জ্যোতিষ্মান হইয়া থাকে মীরার কণ্ঠস্বর—মীরার [illegible] আহ্বান 'মিহির [illegible],

কতক্ষণ এই মোহময় আবেশে কাটিয়া [illegible]। রামদীনের কণ্ঠস্বরে মিহিরের চমক ভাঙিল। রামদীন একাধারে মিহিরের ভৃত্য ও গৃহিণী। স্বপ্নরাজ্য থেকে বাস্তব জগতে নামিয়া আসার বিহ্বলতা কাটিলে মিহির রামদীনকে ডাকিয়া পাঠায়।

সে উচ্চৈঃকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—"কি রে রামদীন, ব্যাপার কি?"

রামদীন কম্পিত হস্তে একখানা টেলিগ্রাম মিহিরের হাতে দিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকে। পাড়াগাঁয়ের লোক, টেলিগ্রাম অর্থই কারো সাংঘাতিক অসুখ বা মৃত্যু।

টেলিগ্রাম পড়িয়া মিহিরের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া যায়। হাত থেকে টেলীগ্রামখানি পড়িয়া যায়। ভয়ে ও উদ্বেগে রামদীনের মুখ পাংশুবর্ণ হয়, মীরা ধীরে কাগজখানা তুলিয়া পড়ে—"Bride Selected Come for final Selection."

[নয়]

বীরবল এতদিনে নিজেকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। বহির্গমনের পথ পাইয়া তার অফুরন্ত কর্মশক্তি প্রাণ প্রবাহে সবেগে সঞ্চরমান। কোন অদৃশ্য শক্তি তাহাকে সকলের পশ্চাৎ থেকে টানিয়া একেবারে সভার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। সেও মানিয়া নিয়াছে এই তার নিয়তি, এই তার পথ।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে এত সহজে এবং এত স্বাচ্ছন্দে বীরবল

তার স্থান দখল করিয়াছে যে মনে হয় ইহার জন্যই সে বহুদিন থেকে প্রস্তুত ছিল, ইহা তাহারই জন্য সৃষ্ট। যে নিবিড় কুজ্ঝটিকা চারিদিক হইতে আবৃত করিয়া তাহার কর্মশক্তিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছিল, একটি দমকা বাতাসে হঠাৎ তাহার অবসান ঘটিয়াছে।

আবগারী নেশায় মানুষ মাতাল হয় সত্য, কিন্তু সে মত্ততা ক্ষণিকের। আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে সে মত্ততা তাকে প্রতিমুহূর্তে পাগল করিয়া তোলে না। কিন্তু যশের নেশা, লোকচক্ষে প্রতিষ্ঠালাভের নেশা, মানুষকে অনিবার্যরূপে প্রমত্ত করিয়া তোলে, পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির মত সারাক্ষণ তার পিছনে পিছনে ফিরিয়া তাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। বীরবলকে এই যশের নেশায় পাইয়া বসিল, তার দিনগুলি যেন পাখীর মত ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। প্রস্ফুটিত পদ্মের মত তার জীবনের পাপড়িগুলি নানাদিকে বিকশিত হইয়া উঠিল।

কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতার আগমন উপলক্ষে পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজে একটি জনসভা আহুত হইয়াছে। বীরবল সেই সভায় একজন বক্তা। সমাজ-গ্রন্থাগার হইতে সে ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত কয়েকখানি প্রামাণিক গ্রন্থ নিয়া আগাগোড়া বিস্তারিতভাবে পড়িয়াছে; রামমোহনের যুগে বৈজ্ঞানিক ধর্মব্যবস্থার প্রতি লোকের সহজ অনুরাগ, পাদরীদের প্রচারের ফলে হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠান সমূহের প্রতি শিক্ষিত লোকের শ্রদ্ধাহীনতা, খ্রীষ্টান ও মুসলমান উভয় ধর্মের সম্মিলিত প্রভাবে হিন্দুধর্মকে শুধুমাত্র পৌত্তলিক ধর্ম বলিয়া লোক চক্ষে হীন করিবার প্রচেষ্টা প্রভৃতি কারণে হিন্দুধর্মকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থান যে অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সুনিপুন বিশ্লেষণ করিয়া সে তার বক্তব্যকে প্রবন্ধাকারে লিখিল। তারপর সেই লিখিত

প্রবন্ধ সে এতবার পড়িল যে মনে মনে নিঃসংশয় হইল ইহার একটা অক্ষরও সে ভুলিবে না।

বলা বাহুল্য বীরবল সেইদিন বক্তা হিসাবে বেশ নাম করিল সেই উন্নতনাসা যুবকের স্পষ্ট ও সবল উচ্চারণে, ভাষার এবং ভাবের সাবলীলতায় ও দৃঢ়তায় প্রশংসার অযাচিত বন্যা তাকে প্লাবিত করিয়া দিল। সভাশেষে বহু ভদ্রমহিলা ও তাঁহাদের তরুণী কন্যারা তাকে অভিনন্দিত করিলেন, বীরবলের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে হইল প্রশংসার মদিরা মানুষকে মদ্যপানের চেয়েও বেশী মাতাল করিয়া তোলে, বিশেষতঃ সে প্রশংসার মূল উৎস যদি সুন্দরী তরুণীদের সলজ্জ মনোরম ভঙ্গী ও কথা বলার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়।

কী একটা অননুভূত প্রবল উত্তেজনায় বীরবলের সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, তার মনে হইল সে বুঝি ফাটিয়া পড়িবে, এত গৌরব বুঝি সে সহ্য করিতে পারিবে না। ভীড়ের মধ্য থেকে কোনমতে ছুটিয়া সে বাহিরে আসিল। বহুক্ষণ জন বিরল রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইল, তারপর একসময় নিঃশব্দে হোষ্টেলে নিজের ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। ঠাকুর একপাশে খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল কিন্তু খাইতে তার রুচি ছিল না।

অনেক বেলায় বীরবলের ঘুম ভাঙ্গিল। বহুক্ষণ চক্ষু মেলিল না। বাহিরের কোলাহল চেচামেচি সে প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিল। সমস্তই তার ভাল লাগিল "বাখরখানি", "মাঠামাখম", "ক্ষীরমোহন" প্রভৃতি চীৎকার তার কাছে "বউ কথা কও", "পিউ কাহা", "কুহুউ"র চেয়েও মিষ্টতর মনে হইল।

কিন্তু আপ্রত্ত লোক বেশীক্ষণ চক্ষু মুদিয়া থাকিতে পারে না। ঘুমের নেশাটুকু কাটিয়া গেলে সে চক্ষু মেলিল। প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল

দেয়ালের টাইম্‌ পিস্‌টার উপর। বাব্বাঃ! সাড়ে আটটা বাজিয়া গিয়াছে! এতক্ষণ সে ঘুমাইয়া! তড়াক করিয়া সে উঠিয়া বসিল। চমকিত হইয়া দেখে সামনের চেয়ারে একটি সুবেশ যুবক বসিয়া, বীরবল একটু অবাক হইয়া তার দিকে তাকাইতেই যুবকটি বলিল—"কি চিন্‌তে পাচ্ছেন না বুঝি? করোনেশন পার্কে আলাপের কথা একেবারেই ভুলে গেছেন দেখছি।"

বীরবল এবার চিনিল। একটু লজ্জিত ভাবে বলিল—"ওঃ আপনি, কতক্ষণ বসে আছেন? আমাকে ডাক্‌লেন না কেন? কি রকম যেন আজ দেরীতে ঘুম ভাঙ্‌ল। তাইত, আপনি হয়তঃ অনেকক্ষণ বসে আছেন। আচ্ছা, একমিনিট বসুন আমি আসছি।"

বীরবল তাড়াতাড়ি উঠিয়া দু'মিনিটের মধ্যেই হাতমুখ ধুইয়া আসিল। অত্যন্ত অনুতপ্তস্বরে বলিল—"দেখুন, আপনাকে হয়তঃ অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে বলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত। চাকরগুলো ও এমনি বেয়াড়া এতদেরী হয়ে গেল, একটা ডাক যে দেবে সেদিকে খেয়াল নেই।"

যুবকটি হাসিয়া বলিল—"থাক্‌, থাক্‌, সে জন্ত আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। আপনি যে রকম গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, ডাক দিলে হয়তঃ উল্টো ফল হত, এই ভয়েই তারা আসে নি।"

তারপর বীরবলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—"বসুন, বসুন, আপনার সঙ্গে আমার দু' একটি কথা আছে। আমি বলেছিলাম, এজন্ত—যদি দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করে আরও আধঘণ্টা বেশী বসিয়ে রাখেন, তাতে আমার অসুবিধা বাড়বে বই কমবে না।"

এই সময়ে বীরবলের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল কোন এক রবিবার ভোর ৯টার সময় এই যুবকটির সঙ্গে তার ওদের বাড়ীতে যাবার

কথা ছিল। ইলেকসনের উত্তেজনায় ও ব্যস্ততায় সে কথা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এইবার বীরবল সত্যই কুণ্ঠিত হইল!

যুবকটি বলিল—"হ্যাঁ দেখুন, লজ্জাটা হচ্ছে মানবের বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপার। আপনার পরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত লোককে রাস্তায় আপনার সামনে এক কাব্‌লীওয়ালা অপমান করলে, আপনি লজ্জিত হলেন। সেই ভদ্রলোককে হয়তঃ আরো দু'বার সেই কাব্‌লীওয়ালা অপমান করেছে, কিন্তু আপনি জানেন না, তাতে কিন্তু আপনি লজ্জিত হন নি।"

বীরবল বুঝিতে পারিল না যুবকটি কিসের ইঙ্গিত করিতেছে। যুবক বলিয়া চলিল—"আজ হয়তঃ অনেকক্ষণ বসে আছি ভেবে আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন, কিন্তু আরও দু'একদিন যদি আমি বসে থেকে থাকি যা আপনি জানেন না, তাতে কি আপনার কুণ্ঠা আসে?"

বীরবল আর অজ্ঞতার ভাণ করিল না। অনুতপ্তস্বরে বলিল—"দেখুন, সে জন্য আমি বাস্তবিকই খুব লজ্জিত। ইলেক্‌সনের হৈ চৈতে আমি আপনার সঙ্গে engagementএর কথা একেবারেই ভুলে গেছ্‌লাম। আপনি আরও ২।১ দিন এসে ফিরে গেছেন? ছিঃ, ছিঃ, সেটা ও বড়ই লজ্জার ব্যাপার হয়েছে!"

যুবকটি হাসিয়া বলিল—"তবেই দেখুন লজ্জাটা আপেক্ষিক। কাজেই এতদিন পরে আর মিছামিছি লজ্জিত হবেন না। যা হবার তা ত হয়েই গেছে। কাল আপনার সময় আছে ত?"

বীরবল—"হ্যাঁ।"

যুবক—"তবে কাল ভোরে এমনি সময় আসব, কেমন?"

যুবকটি উঠিল। বীরবল একটু আপ্যায়িতের সুরে বলিল—"এককাপ চা খেয়ে যান না?" জোরে হাকিল—"রাজু, রাজু!"

বলা বাহুল্য রাজু হোটেলের একজন চাকরের নাম।

যুবক—"না, না, সেজন্য ব্যস্ত হবেন না। ও আর একদিন খাওয়া যাবে। আমার আরও কয়েক জায়গায় যেতে হবে। এখন চল্লুম। নমস্কার।"

বীরবল—"নমস্কার।"

[দশ]

পরদিন ভোরে নির্দিষ্ট সময়ে যুবকটি আসিয়া উপস্থিত। বীরবল পূর্ব্বেকেই তৈয়ারী ছিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই দুইজনে বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তায় বীরবল বলিল—"যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?"

যুবক—"স্বচ্ছন্দে, আমার নাম বীরব্রত।"

বীরবল—"আপনি কি করেন?"

বীরব্রত—"ঢাকা কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি।"

আবার কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ। নবাবপুরে পড়িয়া ডান দিকে মোড় ফিরিবার সময় বীরবল জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার বাসা কোথায়?"

বীরব্রত—"নারিন্দা।"

একটা একতালা হলদে রঙের বাড়ীর সামনে আসিয়া উভয়ে থামিল। তারপর—বীরবলকে একটু দাঁড়াইতে বলিয়া বীরব্রত ভিতরে চলিয়া গেল।

বাড়ীটি ছোট্ট হইলেও সুন্দর। বাহিরের দিকে একটি বড় ঘর, দরজার বাহিরের প্রস্তরফলকে লেখা—জিতব্রত রায় এম, এ, বি, এল, উকীল জজকোর্ট। তারপাশে একটি ছোট ঘর। ভিতরেও ৩।৪ খানা ঘর আছে বলিয়া মনে হয়।

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। বীরব্রত মুখ বাহির করিয়া ডাকিল "আসুন"।

বীরবল ভিতরে গেল।

ঘরটি বীরব্রতের পড়ার, বন্ধুবান্ধবদের বসিবার এবং শোবার ঘর। ভিতরে ঠাসাঠাসি ভাবে দুইটি ছোট আলমারি, একখানা ছোট্ট টেবিল, খানতিনেক কাঠের চেয়ার। আলমারী। মোটা মোটা বইতে গাদানো, ঘরের চারিদিকে এত ফটো টাঙানো যে মনে হয় এটি বুঝি কোন ফটোর দোকান। যতীন দাস থেকে ট্রট্‌স্কি সকলের ফটোই আছে।

বীরবলকে একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বীরব্রত তার পাশের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। তারপর প্রথম দিনের কথার সূত্র ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অনুশীলন সমিতির নাম আপনি শুনেছেন?"

বীরবল—"না"।

বীরব্রত—"পুলিনবাবুকে জানেন?"

বীরবল—"নাম শুনেছি। যিনি লাঠি ও ছোড়া খেলা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতেন?"

বীরব্রত—"হ্যাঁ, আপনি ফ্রেঞ্চ রিভলিউসন সম্বন্ধে কোন বই পড়েছেন?"

বীরবল—"না।"

বীরব্রত—"কার্ল মার্ক্‌স্‌ সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

বীরবল—"মাসিক পত্রিকার মারফৎ নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।"

এমন সময় ভিতরের দরজাটা খুলিয়া গেল এবং চায়ের ট্রে নিয়া একটি তরুণী প্রবেশ করিল। অত্যন্ত সপ্রতিভ, অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচ। খাপে খোলা তলোয়ারের মত সমস্তটা অত্যন্ত উজ্জল অথচ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যৌবন তার আগমন বার্তা ঘোষণা করিয়াছে অথচ নিষ্ঠুর নিপীড়নে তার সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত লাবণ্য নিষ্পেষিত করিবার কঠোর প্রয়াস সর্বাঙ্গে বর্তমান।

বীরবল কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অপরিচিতা তরুণীর এত নৈকট্য তার জীবনে এই প্রথম।

তরুণী চায়ের ট্রেটা নামাইয়া রাখিতেই বীরব্রত বলিল—"ইনিই বীথি, আমার বন্ধু বীরবল, এর কথাই আমি তোমাকে সেদিন বলেছিলাম।"

তরুণী যুক্তকরে বলিল—"নমস্কার।"

বীরবল যেন দিশাহারা হইয়া গেল। নমস্কারটা তারই আগে করা উচিত ছিল। প্রতিনমস্কারের কথা ভুলিয়া গিয়া কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। বিশেষতঃ ঘরটি এত ছোট যে নিজেকে সামলাইবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হঠাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইতে গেল। বেসামাল বা হাতের ধাক্কায় ট্রে থেকে একটা পেয়ালা বাহিরে পড়িয়া চুরমার। বীরবল ভাবিল— ছুটিয়া বাহিরে পলাইবে। কিন্তু পা চলিল না।

তরুণীটি তাকে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা করিল। বলিল— "আপনি বসুন, ও জন্য লজ্জিত হবেন না। দাদার ঘরখানাও এত ছোট যে জগন্নাথ না হলে এখানে নড়াচড়া মুস্কিল।"

বীরবল প্রত্যুত্তরে শুধু বোকার মত হাসিল। তার সহজ স্বাচ্ছন্দ্যভাব তখনও ফিরিয়া আসে নাই। মনে মনে ভাবিল—"ছিঃ, ছিঃ, কি কেলেঙ্কারীটাই না আজ করলাম।"

তরুণী দাদার দিকে তাকাইয়া বলিল—"দাদা, তোমরা বোস, আমি এক্ষুনি আসছি।"

একটা বিদ্যুৎ চমকের মত সে ভিতরে চলিয়া গেল।

বীরবল জিজ্ঞাসা করিল—"এটি কি আপনার বোন?"

বীরব্রত—"হ্যাঁ। আমার বড় আদরের এই একমাত্র বোনের শিক্ষার ভার আমিই গ্রহণ করেছি। আমার ইচ্ছা সুবীথিকে আমি বিপ্লবের আদর্শে গড়ে তুলব। বাবা ত মামলা মোকর্দ্দমা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তার অন্যদিকে মন দেবার অবসর নেই।"

বীরবল একটু অবাক হইয়া বীরব্রতের মুখের দিকে তাকাইল। প্রথম দিন থেকেই এই যুবককে তার নিকট রহস্যময় বলিয়া বোধ হইয়াছে। বিপ্লব, সন্ত্রাসবাদ, প্রভৃতি কথার সঙ্গে পরিচিত না থাকিলেও কেমন যেন একটা অজ্ঞাত ভীতি তার মনকে আচ্ছন্ন করিতেছিল।

বীরব্রত বলিয়া চলিল—"সিপাহী বিদ্রোহ যে বিপ্লবের বীজ বপন করেছিল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আবহাওয়ায় তাকে অঙ্কুরিত ও পরিবর্ধিত করেছে, তাকে পরিপুষ্ট করাই আমাদের ব্রত।"

বীরবল যেন এবার একটু বুঝিতে পারিল, কিন্তু ভয় গেল না।

বীরব্রত বলিল—"এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এখানে একটা গুপ্ত সমিতি গঠন করেছি, আমাদের বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা সাত জন।"

এই সময় ট্রে নিয়া সুবীথি আবার প্রবেশ করিল। বড় একটা ডিসে ভর্ত্তি গরম লুচি ও আলুভাজা।

বীরবল একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল—"একি, একি করছেন আপনারা? আমি খাব ত—"

বীরব্রত বাধা দিয়া বলিল—"গরম লুচি পেটে না পড়লে গরম গরম ভাব আসে না। দ্বিজু রায়ের নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—পড়েছেন ত?" সুবীথি বীরবল ও বীরব্রতকে প্লেটে করিয়া লুচি সাজাইয়া দিল এবং চায়ের পেয়ালা আগাইয়া দিল।

বীরব্রত বলিল—"বীথি, তুই বস্‌লি না? শীগ্‌গির চা ও লুচি নিয়ে বসে যা।" তারপর বীরবলের দিকে তাকাইয়া বলিল—"দেখুন বীরবলবাবু, স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের দাবী আমরা মানি। সভাসমিতিতে কাগজে ইহা আমরা প্রচার করি। কাজের বেলায় তা কেন হবে না?"

সুবীথি অপরিচিত বীরবলের সামনে খাইতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। হাজার হইলেও মেয়ে মানুষ ত?

বীরবল বলিল—"না, না তাকি হয়? আপনি না বসলে আমরাও খাব না।" বীরবলের সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে।

বীরব্রত হাসিয়া বলিল—"শুন্‌লি ত, এবার বোস্‌।"

চা খাইতে খাইতে দেশোদ্ধারের আলোচনা বেশ জমিয়া উঠিল।

বীরবল এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, এই দশবিশ জন লোকের চেষ্টায় এত বড় একটা বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংশ হবে এটা আপনারা সম্ভব মনে করেন?"

সুবীথি বলিল—"কেন মনে করব না? যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধদেব, এরা প্রথম কয়জন সহায়ক পেয়েছিলেন? বড় বড় কাজের আরম্ভ এরূপেই হয়।"

বীরব্রত বলিল—"দেখুন বীরবলবাবু, গীতা পড়েছেন ত? গীতার

[illegible]
এখবার তিনি দেখবেন ?"

বীরবল বলিল—"কিন্তু কাজ করার আগে বিচার করতে হবে না যে কাজটা সম্ভব কি অসম্ভব ?"

বীরব্রত প্রশান্ত ভাবে বলিল—"দেখুন, বিচার করে কাজ করা আর সাঁতার শিখে জলে নামা প্রায় একই কথা। পৃথিবী যে শস্যশ্যামলা হয়েছে তার পেছনে কত কোটি বৎসরের সাধনা রয়েছে বলতে পারেন ? জলন্ত ধাতুপিণ্ডকে উর্বর শস্যভূমিতে পরিণত করতে কত অসংখ্য যুগের পুঞ্জীভূত প্রচেষ্টা দরকার হয়েছে জানেন ? আমাদের বিচারবুদ্ধি কতটুকু ? কতটুকু ভবিষ্যৎ আমরা দেখতে পাই ?"

বীরবল একতাল লুচি মুখে পুরিয়া চিবাইতেছিল, কাজেই তাড়াতাড়ি কিছু বলিতে পারিল না। এক চুমুক চায়ের সাহায্যে সেটাকে গলাধঃকরণ করিয়া বলিল—"কিন্তু তাই বলে কেউ যদি চাঁদ ধরার চেষ্টা করে সে চেষ্টাকে নিরর্থক বলতে পারব না ?"

এই সমিতির কাজ সুবীথির প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। তাই ইহার উপর কোন আঘাত কোন সংশয় সে সহ্য করিতে পারে না। বীরব্রত তাকে কত বুঝাইয়াছে যে আঘাত সহ্য করার শক্তি না থাকিলে কোন মহৎ কাজের যোগ্যতা লাভ হয় না। কিন্তু এই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে যাকে সে একমাত্র শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সমস্ত কামনা বাসনা, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে উজাড় করিয়া যার পায়ে ঢালিয়া দিয়াছে তার প্রতি সামান্য অবিশ্বাসে তার সমস্ত সংযম সে হারাইয়া ফেলে।

সুবীথির চক্ষে জল আসিল। কোনমতে নিজেকে সামলাইয়া নিয়া

[illegible]

বলিল—“[illegible] এই [illegible] কাজকে আপনি [illegible] [illegible] সঙ্গে তুলনা করছেন ?”

বীরবল লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইল। সে তাড়াতাড়ি বলিল—“না, না, সে কি মিস্ রায়! বীরব্রত বাবুর সঙ্গে আমার একদিনের পরিচয় হলেও এটা আমি বুঝেছি তিনি দেশকে আন্তরিক ভালবাসেন। আজ দেখলাম আপনিও দেশকে তার চেয়ে কম ভাল বাসেন না। আপনাদের এরূপ মহৎ প্রচেষ্টাকে নিন্দা করব এতটা দেশদ্রোহী আমি নই। আমি শুধু ফলাফল সম্বন্ধে একটু আলোচনা করছিলাম, সেও শুধু ব্যাপারটাকে নিজের কাছে সুস্পষ্ট করে তোলবার জন্য।”

বীরব্রত এবার বলিল,—“না না বীথি, বীরবলবাবুর উপর অবিচার করিস্ না। ইনি এদিকে সম্পূর্ণ নূতন। এ সম্বন্ধে অন্যের মতামত নিজের বলে চালিয়ে দেবার মত ক্ষমতা ওর এখন পর্যন্ত হয় নাই। করোনেশন পার্কের সেদিনের ঘটনা তোকে বলেছি ত। বীরবলবাবু ছুটে বক্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।”

বীরবল লজ্জিত হইলেও কুণ্ঠিত হইল না। তার জড়তা অনেকক্ষণ হয় কাটিয়া গিয়া সহজভাব ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বীথিকে বলিল—“কিছু মনে করবেন না মিস্ রায়। পাড়াগাঁয়ের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় থাকলে বুঝতেন, সেখানকার লোক এ সব বিষয়ে কত অজ্ঞ। দেশব্যাপী যে এত দুঃখ দৈন্য, এত অত্যাচার, অনাচার, তার কোন খবরই তারা রাখে না, প্রতিকারের চিন্তা করা ত দূরের কথা। আমি ত সেই পাড়াগাঁয়েই বর্ধিত। কাজেই আমার কথায় আপনাকে কোন আঘাত দিয়ে থাকলে আমাকে ক্ষমা করবেন।”

সুবীথি এতক্ষণে সহজভাব ফিরিয়া পাইয়াছে। সে বলিল—“আমারই বরং অন্যায় হয়েছে, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছি। থাকগে

[illegible]
ফুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সে সব খবর তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। পারবেন না একাজ বীরবলবাবু? পারবেন না ছুটিতে ছুটিতে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে তাদের সুপ্ত চেতনাকে, সুপ্তপ্রায় কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে?"

বীরবল দৃঢ়স্বরে বলিল—"খুব পারব। করে নিন আমাকে আপনাদের সমিতির সভ্য! আজ থেকে দেশের জন্য আমার জীবন উৎসর্গীকৃত করলাম।"

বীরব্রত এতক্ষণ কিছুই বলে নাই। বীরবল থামিলে পর ধীরে ধীরে বলিল—"আচ্ছা বীরবলবাবু, আপনাকে আর আটকে রাখব না। বেলাও অনেক হয়ে গেছে।"

সুবীথির দিকে তাকাইয়া বলিল—"বীথি, তবে কার্ল মার্ক্স ও ট্রট্স্কির দু'খানা বই দিয়ে দাও।"

বীথি বই আনিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

বীরব্রত বলিল—"দেখুন বীরবলবাবু, যে বই দু'খানা আপনাকে দেওয়া হবে, সাবধানে নেবেন কিন্তু। পুলিশ টের পেলে বিপদে পড়ার আশঙ্কা আছে।"

সুবীথি খবরের কাগজে জড়ানো দুইখানা বই আনিয়া বীরবলকে দিল। বীরবলের মনে হইল বুঝি দুইটা টোটাভরা রিভলভার।

বীরব্রত মৃদুকণ্ঠে বলিল—"যাবার সময় চারিদিক দেখে যাবেন কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে কি না।"

বীরবলের এবার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ইচ্ছা হইল বই দুখানি ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু পৌরুষে বাধা দিল।

রাস্তায় আসিয়া মনে হইল সমস্ত পথচারীই যেন তার ঐ বই দুই-খানির দিকে তাকাইয়া, প্রত্যেকেই যেন তাকে অনুসরণ করিতেছে।

বীরবলের অনুশোচনা আসিল। কেন সে সাধ করিয়া এই বিপদ বরণ করিয়া নিতেছে? না—বই দু'খানি সে কালই ফিরাইয়া দিবে। আর ওদের গুপ্ত সমিতির সভা হইবে না।

[এপার]

মিহির ভাবিয়াছিল দেশে যাইবার পূর্বে আর মীরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে না কিন্তু যাবার পূর্বদিন তাকে নিজের অজ্ঞাতসারেই মীরাদের বাড়ীর দিকে টানিয়া নিয়া গেল।

গেটের সামনে মিঃ মেয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ। মিহির পাশ কাটাইয়া যাবার উপক্রম করতেই মিঃ মেয়ন তাকে একরকম টানিয়া ভিতরে নিয়া গেলেন।

ড্রইংরুমে বসিয়া মিহির নিজের অবিবেচনার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তার মনের যে রকম অস্বাভাবিক অবস্থা সে কি করিয়া মীরার সম্মুখীন হইবে? আগন্তুকের সম্মুখে বেসামাল পরিয়ে যাব, অপরিচিতাকে যেমন বিব্রত করে, তার বেসামাল মন মীরার আগমন সম্ভাবনায় তেমনি বিব্রত বোধ করিতে লাগিল।

"এক মিনিট, আমি আস্‌ছি" বলিয়া মিঃ মেয়ন ভিতরে চলিয়া গেলেন। মিহির বসিয়া ভাবিতে লাগিল, চিন্তাসূত্রের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশগুলি জোড়াতাড়া দিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে লাগিল। কি

বলিবে সে মীরাকে? কোন্ আশার বাণী শুনাইবে এই কন্যার অনভিজ্ঞার প্রাণঢালা ভালবাসার বিনিময়ে?

সে কি মিথ্যা স্তোক বাক্যে ইহাকে ভুলাইবে? না, তাহা অসম্ভব। অতটা নীচ সে হইতে পারিবে না। সহজ সরল সত্যকথা অকপটে সে বলিবে।

মীরা আসিল, কম্পিত প্রায়—পাণ্ডুর চাঁদ! আজ সে মিহিরকে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিল না, প্রচণ্ড আনন্দের আবেগে তাহার উপর পড়িল ফাটিয়া পড়িল না। ধীরে ধীরে ম্লানমুখে মিহিরের পাশে একটা সোফায় বসিল।

মিহির জানিল কিন্তু হঠাৎ মুখ তুলিতে পারিল না। মিঃ মেয়ন গাড়ীতে সশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

মিহির ধীরে ধীরে মুখ তুলিল, অত্যন্ত সন্তর্পণে, অত্যন্ত নীরবে। দেখে অবনতমুখী মীরার চোখে অশ্রু। এবার আর মিহির ইতস্ততঃ করিল না। সঙ্কোচে বাহ্যিক আবরণে নিজেকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিল না। মীরার পাশে বসিয়া আস্তে আস্তে তার মাথাটি কোলের উপর রাখিল। অতি মৃদুভাবে তার কেশের মধ্যে করসঞ্চালন করিতে লাগিল। ঝরঝরধারে অশ্রুর প্রবল ধারা মীরার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া মিহিরের পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত করিয়া দিল। মিহিরের মনে হইল যতই বিলাতী আবহাওয়ায় বর্ধিত হউক, মীরার রক্তে যে ভারতীয় নারীর কোমল পেলবতা।

মীরার কান্না আর শেষ হয় না। সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মিহির ধীরে ধীরে বলিল—"মীরা, লক্ষ্মীটি, কেঁদো না। তোমার কান্নায় যে আমার কান্না পাচ্ছে।"

স্নেহের পরশে মীরার ক্রন্দনবেগ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। তার দীর্ঘদিনের সাধনার ধন, তার জীবনের একমাত্র সার্থকতা পর হইয়া যাইতেছে—ইহাতে সে বাঁচিবেই বা কি করিয়া এবং বাঁচিয়াই বা কি করিবে?

সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া সে যে তিলে তিলে পলে পলে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছে? মিহিরের অভাবে তার জীবন যে ব্যর্থ, প্রয়োজনহীন বিড়ম্বনা মাত্র, মিহির কি তাহা জানে না?

মিহির আবার সান্ত্বনার সুরে বলিল—"লক্ষ্মীটি, মুখ তোল, কথা কও। আমি যে তোমার এ কান্না কিছুতেই সহ্য করতে পাচ্ছি না।"

মিহিরের কণ্ঠ ভগ্ন হইয়া আসিল। সে আস্তে আস্তে মীরার মুখখানা তুলিয়া ধরিল এবং একটা প্রচণ্ড লোভকে তীব্রভাবে দমন করিল।

এতক্ষণের কান্নায় মীরা নিজেকে অনেকটা হাল্কা করিয়াছে। এবার ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিতেই মিহিরের স্নিগ্ধ প্রীতিঘন দৃষ্টি তার মনের সর্বাঙ্গ শান্তির মধুর অবলেপে জুড়াইয়া দিল।

মিহিরের কণ্ঠ আবেগ কম্পিত। মিহির বলিল—"মীরা, তুমি ত কাঁদছ, কেঁদে মনের দুঃখ প্রকাশ করার একটা রাস্তা তোমার আছে, কিন্তু আমি কি করব বলত? আমার সমস্ত অন্তরটা তীব্র হাহাকারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, সেখানে এক ফোঁটা জল নেই, একটু আলো নেই, একটু বাতাস নেই। জানিনা ভবিতব্যের কি লেখা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু অনিশ্চিততার ভয়াবহতা আমাকে কি দারুণ মর্মপীড়িত করছে, তা তোমাকে বুঝাতে পারলে তুমি নিজের দুঃখ সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে।"

মীরা একটু অবাক বিস্ময়ে মিহিরের দিকে তাকাইল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না কি এমন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এই বিলাত ফেরৎ

ম্যাজিষ্ট্রেটকে এমন পীড়িত করছে। মমতা মাখানো মৃদুকণ্ঠে বলিল—"মিহির তবে কি তুমি আমার কাছে একেবারে বিদায় নিতেই এসেছ? বল, বল, সত্যি করে বল। তোমার ভয় নেই, এখানো যখন টিঁকে আছি, তখন এ আঘাতেও ভাঙ্গব্ না।"

মিহির অনুতপ্তকণ্ঠে বলেন—"দেখ মীরা, যাবার আগে তোমাকে সব কথা খুলেই বলব। বিলেত থাকতেই আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম এবং সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম তা হয়ত তুমি জান। তখন অবিশি আর কোনদিক ভেবে দেখিনি। তোমার বাবা পীড়াপীড়ি করলে হয়ত বিয়েও হয়ে যেত। কিন্তু দেশে এসে বুঝতে পারলাম আমাদের মিলনের মাঝখানে কী দুর্লঙ্ঘ্য বাধা।

মীরার মুখ অজ্ঞাত ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

মিহির বলিয়া চলিল—"তুমি ত জান দেশে আমার রায় বাহাদুর বাবা আছেন, আর আছেন মা। নিজস্ব কোন স্বাধীন ইচ্ছা বা মতামত থাকলে রায় বাহাদুর হওয়া মুস্কিল, তাই বাবা যে আছেন ছাত্রজীবনে তার টের পেতাম মনি-অর্ডারে যখন টাকাটা আস্ত তখন, এখন তা-ও পাই না। কিন্তু মা!" বলিতে বলিতে মিহিরের মুখ চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। "মায়ের ব্যক্তিত্ব, মায়ের স্বাধীন ইচ্ছা, মায়ের নিজস্ব মতামত, তার চিন্তা ও ভাবধারা আমার প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। মায়ের কেন কথা অবহেলা করতে আগে পেতাম ভয়, এখন পাই দুঃখ। সেই শুচিশুভ্র করুণাঘন মমতাময়ী কল্যাণরূপিনী মূর্তি, তার আবির্ভাবে সমস্ত পরিবেশ সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে ভরে উঠে, মহিমায় ও পবিত্রতায়—শান্তিতে ও সুষমায় অপূর্ব গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।"

মীরা মিহিরের উচ্ছ্বাসে বাধা দিল না। শুধু মাত্র গভীর বিস্ময়ে এই বিলাত ফেরৎ ম্যাজিষ্ট্রেট বহুদিন বিলাতে এবং বিদেশে কাটাইয়াও মাকে এরূপ ভাবে মনে রাখিয়াছে, তার প্রতি ভক্তিতে, শ্রদ্ধায়, প্রীতিতে মন আর একবার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে প্রশান্তভাবে মিহিরের মুখের দিকে তাকাইল।

মিহির সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়াও থামিল না। মীরার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই বলিতে লাগিল—"দেশে এসে বুঝলাম, মায়ের ইচ্ছা তার পছন্দমত মেয়ে আমি বিয়ে করি। আমার একটা পছন্দ থাকলেও সেটা গৌণ।"

মীরা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"তুমি তাঁর পছন্দের কাছে নিজেকে বলি দেবে? মিহির, এটা কি তোমার মনের কথা, না আমাকে এড়াবার চেষ্টা? শিক্ষিত উচ্চ পদস্থ হয়ে তোমারও এই মনোবৃত্তি?"

এবার ভারতীয় মীরার ভিতর থেকে পাশ্চাত্য মীরা জাগিয়া উঠিল। অপমানে আহত এবং অভিমানে পীড়িত মন আপনার দুর্বলতার জন্য আপনাকে বার বার ধিক্কার দিল।

আঘাতের অতর্কিতায় মিহির খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কি করিবে, কি করিয়া সে বুঝাইবে মীরাকে যে মার ইচ্ছা পদদলিত করিতে পারে না। যতই শিক্ষিত সে হউক, যতদিন পাশ্চাত্যদেশের স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে সে পরিপুষ্ট হইয়া থাকুক, সে যে বাঙ্গালী, সে যে ভারতীয়। আর তার মা!

মিহিরের মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল।

মিহিরের নীরবতায় মীরার মন সংশয়াকুল হইয়া উঠিল। তবে কি মিহিরের সমস্তই অভিনয়? সে কি তার প্রবাস জীবনকে দুদিনের জন্য মধুময় করিয়া তুলিবার একটা অস্থায়ী উপলক্ষ্য?

মীরা তিক্তকণ্ঠে বলিল—"কি নীরব কেন মিহির, উত্তর দাও। দিনের পর দিন ভালবাসার অভিনয় করে, আমাকে এরূপ অপমান করার তোমার কি অধিকার ছিল ?"

দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে মীরার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। একটা জীর্ণ ইষ্টকস্তূপের মতো সে শোফার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বহুক্ষণ কাঁদিবার পর মীরা একটু প্রকৃতিস্থ হইল। চাহিয়া দেখে মিহির তেমনি ভাবে বসিয়া আছে—মুখ মৃতের ন্যায় বিবর্ণ, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। দুই বিন্দু অশ্রু গণ্ড বাহিয়া পড়িতে পড়িতে শুকাইয়া গিয়াছে, পাণ্ডুর গণ্ডে তারই অস্পষ্ট রেখা।

মিহির—"দেখি যদি মার পছন্দ করা মেয়েকে কোন অজুহাতে অপছন্দ করতে পারি।"

মীরা—"আচ্ছা, একটিকে না হয় অপছন্দ করলে, কিন্তু এরকমভাবে কয়টিকে অপছন্দ করবে ?"

মিহির—"দেখি যতটিকে পারি ?"

মীরা—"আর যদি অপছন্দ করার কোন অজুহাতই খুঁজে না পাও ?"

মিহির আবার নিস্তব্ধ হইল। তারপর কি তাহা সে ভাবিয়া দেখে নাই। জলে নিমজ্জমান ব্যক্তি সামান্য তৃণখণ্ডের অবলম্বনেই আশ্বস্ত হইয়া উঠে, ভাবিয়া দেখে না ইহা তাহার ভার সহ্য করিতে পারিবে কিনা। তাইত মার পছন্দকরা মেয়েকে অপছন্দ করার কোন সঙ্গত অজুহাতই যদি সে না পায়, তখন সে কি করিবে ?

মীরার সঙ্কোচ বহুক্ষণ থেকেই চলিয়া গিয়াছে। জীবনের যখন সব শেষ হইতে বসিয়াছে, তখন আর সঙ্কোচ কি ?

মিহিরের একখানি হাত ধরিয়া সে বলিল—"বল, বল মিহির, তা হলে কি করবে ?"

মিহির তবু নিরুত্তর। দেয়ালের ঘড়িটি শুধু অবিশ্রাম টিক্ টিক্ করিতে লাগিল।

অসহায় ভাবে মিহির ডাকিল—"মীরা"—

মীরা তাকাতেই মিহির বলিল—"তুমি আমাকে কি করতে বল? আমি ত ভেবে কোনই কূল কিনারা পাচ্ছি না। বল, তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।"

মীরাই বা কি বলিবে? এতক্ষণে সে মিহিরের অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝিয়াছে মাকে কষ্ট দেওয়া মিহিরের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইবে। তার মার অসম্মতিতে তাদের বিবাহিত জীবন কল্যাণের হইবে না।

মীরা-ও তাই এবার নীরব। শুধু মিহিরের হাতখানা তার হাতের মধ্যে ঘামিয়া উঠিল; অস্তগমনোন্মুখ ভাস্কর কিরণে বিলাতী পামের ছায়াগুলি দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া একসময়ে মিলাইয়া গেল। দূরে একটা কোকিল অবিশ্রান্ত ডাকিতে লাগিল "কুউউ" "কুউউ"।

মীরার মনে প্রবল দ্বন্দ্ব। মিহিরকে সে ভালবাসে, মিহিরের জন্য সে সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে, তাই মিহিরের প্রবল মানসিক অশান্তি তাকে পীড়িত করিল। এতক্ষণ সে শুধু নিজের দিকটাই দেখিয়াছে। নিজের দুঃখ, কষ্ট, নিজের অশান্তি ব্যর্থতা এই নিয়াই ব্যথা পাইতেছে। মিহিরের কথা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই, তাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়া আরও ব্যথিত আরও মর্মাহত করিয়াছে।

মীরার মন অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। যাক্ তার জীবন ব্যর্থ হইয়া, আসুক্ অতলস্পর্শী অন্ধকার তার জীবনের সমস্তগুলি আলো নির্বাপিত করিতে, কিন্তু মিহিরের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, এই মানসিক অশান্তি ত প্রশমিত হইবে।

এই ভাবনায় মীরা কোথা হইতে যেন মনে এক বিরাট শান্তি লাভ করিল। তার সমস্ত আত্মপরায়ণতা, সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি ছাপিয়া প্রবল হইয়া উঠিল—মিহিরের প্রতি তার শুভেচ্ছা, মিহিরের প্রতি তার ভালবাসা। এক অপূর্ব আত্মপ্রসাদে, এক অভিনব প্রশান্তিতে তার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শুভবুদ্ধি তার মনকে সমস্ত তুচ্ছতার বহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল।

তখন আত্মপ্রত্যয়ের নির্ভরতা তার মনের সর্বাঙ্গে। মীরা ডাকিল—"মিহির!"

মীরার অকম্পিত কণ্ঠস্বরে মিহির চমকাইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল অন্ধকার নিবিড় হইয়া ধরণীর বক্ষে নামিয়াছে, রাস্তার আলোগুলি কখন এক একটি করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই অন্ধকারেও মীরার মুখের প্রত্যেকটি রেখা আত্মনির্ভরতায় আত্মশক্তির দৃঢ়তায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

মিহির ধীরে ধীরে উঠিয়া সুইচ্‌টা টিপিয়া দিল। অন্ধকারের অস্পষ্টতায় যে রহস্যের মায়ালোক সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে মানসিক দুর্বলতা যেন যাই যাই করিয়াও যাইতেছিল না।

এবার মীরা অবিচলিত সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল—"মিহির, আমি উপায় ঠিক করে ফেলেছি।"

কি একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে মিহিরের সমস্ত মন কাঁপিয়া উঠিল। তীব্র বিদ্যুতের আলোকে তার মুখখানাকে আরও বিবর্ণ আরও ম্লান দেখাইল। অনেক কষ্টে সে শুধু বলিতে পারিল—"কি"

মীরা মিহিরের মনের ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিয়া বলিল—"ভয় নেই, আমি বিষ খেয়ে বা কেরোসিন কাপড়ে মেখে আত্মহত্যা করে একটা বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি করব না। আমি মন স্থিরকরে

ফেলেছি। মিহির, তুমি তোমার মার পছন্দকরা মেয়েকেই বিয়ে কর।"

মিহির বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল।

মীরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ মিহির, এ জীবনে তোমাকে নাই বা পেলাম? পাওয়াটাই কি সব, চাওয়াটার কি কোন মূল্য নেই? তা ছাড়া, আমার অন্তরে তোমাকে যে ভাবে পেয়েছি, যেরূপ পরিপূর্ণভাবে, সেখান থেকে ত তোমাকে কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না?"

মীরার কণ্ঠে আত্মত্যাগের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মিহির দেখিল —মীরা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় নারী, মুখে তার সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের দীপ্তচ্ছটা, সীতার পার্থিব সুখভোগের প্রতি অনাসক্তির গৌরবোজ্জ্বল মহিমা।

সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় মিহিরের শির আপনা থেকেই নত হইল। এই মহিয়সী মহিলাকে কোনরূপ সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করা, বইয়ে-পড়া বৈরাগ্যের বা স্বার্থগন্ধহীন অনাবিল প্রেমের কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা ত্যাগকে মহান ও নিষ্কাম করিয়া তার সম্মুখে ধরা তার নিকট হাস্যকর মনে হইল।

[বারো]

হোষ্টেলে ফিরিয়া বীরবল প্রথমেই বই দুইখানা তার অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে মিশাইয়া টেবিলের উপর রাখিল, কিন্তু ভয় গেল না। মনে হইল যে যত লোকই তার ঘরে আসিতেছে, সকলেরই দৃষ্টি

যেন তার টেবিলের উপরের বইগুলির মধ্যে। আরও মনে হইল আজ যেন বেশী লোক তার ঘরে আসিতেছে। তবে কি গোয়েন্দা-বিভাগ খবর পাইয়াছে যে তার কাছে দুইখানা বাজেয়াপ্ত বই আছে। বীরবল ঘামিয়া উঠিল।

"এখানে বীরবলবাবু থাকেন ?"

অপরিচিত কণ্ঠস্বরে বীরবলের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কোন গোয়েন্দা নয় ত ? মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিলেন। বীরবল তাকাইয়া দেখিল পিছনে লালপাগড়ী দেখা যায় কি না।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"বীরবলবাবু কার নাম ?"

বীরবল মনে মনে ঢাকেশ্বরীকে বলিল—"হে মা ঢাকেশ্বরী ! এবার কোনরকমে বাঁচিয়ে দাও মা ! প্রতিজ্ঞা করছি আর জীবনে কখনো ওদিক মাড়াব না। বই দু'খানি আজই ফিরিয়ে দোব।"

কোনমতে বলিল—"আমার নামই বীরবল, কেন বলুন ত ?"

ভদ্রলোক টেবিলের যে দিকে বইগুলি ছিল তার পাশে বসিল ও চট্ করিয়া একখানা বই তুলিয়া নিল। বইখানি Trigonometry। বীরবলের বুকের মধ্যে হাতুড়ী পিটিতে লাগিল। এর পরের বইখানিই যে—।

সে তাড়াতাড়ি বলিল—"কি দরকার বলুন ত ? আমার আবার এক্ষুনি বেরুতে হবে।"

ভদ্রলোক বলিলেন—"আমি উয়ারী ক্লাবের সেক্রেটারী। এখানে একটী Inter Provincial Sports organise করতে চাই, আপনার সাহায্য বিশেষ দরকার।"

বীরবলের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। অত্যন্ত উৎসাহের সহিত

ভদ্রলোকের সঙ্গে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল এবং কথার ফাঁকে অত্যন্ত সন্তর্পণে বই দুখানি তুলিয়া আনিয়া নিজের পাশে রাখিল।

এইবার যেন সে নিজেকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। পরিপূর্ণ নিরুদ্বেগে সে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রায় একঘণ্টা এই বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা করিল। সাতদিন পরে সমস্ত ক্লাবের প্রতিনিধিদের সম্মিলিত সভা। বীরবলকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

বীরবল Inter Provincial Sportsএর আয়োজনে ডুবিয়া গেল। কোথায় গেল তার দেশোদ্ধার, কোথায় গেল তার গণ জাগরণ। চাঁদা তোলা, দর্শকদের মণ্ডপ ও রঙ্গমঞ্চ তৈরী করা, স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছা-সেবিকাবাহিনী গঠন করা, এ যেন এক অদ্ভুত উন্মাদনা।

বীরবলের অদ্ভুত কর্মশক্তি ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা দেখিয়া সমস্ত ক্লাবের সম্মিলিত বৈঠকে তাহাকেই Active Secretory করা হইল। আর দুইজন সেক্রেটারী অবশ্য থাকিবেন প্রবীন এবং অভিজ্ঞ, তারা প্রয়োজনমত পরামর্শ দিবেন।

বীরব্রত তিন চারিদিন আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, দেখা পায় নাই। শেষদিন সুবীথিও আসিয়াছিল, না পাইয়া একখানা বায়স্কোপের হাণ্ডবিলের পিছনে লিখিয়া গিয়াছে—

"বীরবলবাবু, ব্যাপার কি বলুন ত? আপনি যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠ্‌লেন। সামনের রোব্‌বার রাত্রি ৮টায় আমাদের বাড়ীতে মিটিং। যেতে ভুলবেন না কিন্তু। বীথি।"

রবিবার ভোরে অগোছাল টেবিলটাকে একটু গুছাইতে গিয়া সুবীথির লেখা বায়স্কোপের হাণ্ডবিলের উপর বীরবলের নজর পড়িল।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা, কিন্তু তাহাই তার মনে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। মনে মনে সে স্থির করিয়াছিল আর ওদের দলে ভিড়িবে না। কাজ কি মিছামিছি একটা অনিশ্চিত গুরুতর বিপদের মধ্যে জড়াইয়া? বই দু খানি ফিরাইয়া দিবে এবং ওদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিবে না।

কিন্তু সুবীথির চিঠি তার সঙ্কল্প শিথিল করিয়া আনিল। সে মনে মনে ভাবিল—"সুবীথি যখন নিজে এসেছিলেন তখন, তখন না গেলে অত্যন্ত অভদ্রতা হয়। আজ ত যাই, তারপরে আর না গেলেই চলবে। শুধু বলে আসব—আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্ রায়, আপনাদের দলে যোগ দিতে পারব না বলে আমি খুব দুঃখিত।"

মনের সঙ্গে এরূপ বোঝাপড়া করিয়া বীরবল যেন একটু শান্তি পাইল।

সুবীথিদের গুপ্তসমিতির অজ্ঞাত কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে তার মনে মনে একটু গোপন আশঙ্কার সৃষ্টি হইতেছিল, অথচ একটা অজানা আকর্ষণও সে এর প্রতি অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তাহা যে সুবীথির উপস্থিতি কল্পনা করিয়া এটা মনে মনে সে কিছুতেই স্বীকার করিত না। মনের এই প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব তার বিশ্রামের শান্তিকে ব্যাহত করিত, মাঝে মাঝে পুলিশ ও গোয়েন্দার আগমন কল্পনায় সে ঘুমের মধ্যেই ঘামিয়া উঠিত।

আজ এত সহজে এরূপ একটা জটিল সমস্যার সমাধান হওয়ায় সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বীরব্রতের পড়িবার ঘরের দরজার কাছটি আসিয়া বীরবল দেখে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কড়া নাড়িতে সাহস পাইল না বা জোরে হাঁকাহাঁকি করিতে সাহস পাইল না, কারণ তার সঙ্গে সেই বই দুখানা। ধীরে ধীরে দরজায় টোকা দিল। কোন সাড়া নেই।

রাস্তার চারিদিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল কেউ তাহাকে লক্ষ করিতেছে কি না। আবার টোকা দিল। এবার দরজা ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল এবং ভিতর থেকে কে বলিল—"আসুন।"

ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভিতরে ঢুকিতেই দরজা বন্ধ হইয়া গেল। বীরবল মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। টর্চের আলো জ্বলিয়া উঠিতেই দেখে "সুবীথি"।

একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"বীরব্রতবাবু কোথায়? আপনাদের না আজ মিটিং, কাকেও দেখছি না যে ব্যাপার কি?"

সুবীথি ধীরে ধীরে বলিল—"বসুন।"

বীরবলের মনে হইল তার গলার স্বর আর্দ্র, কম্পিত। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তার মন আচ্ছন্ন করিল, কোন কথা বাহির হইল না।

অবশেষে সুবীথি বলিল—"বীরবলবাবু, আমাদের সমিতি বুঝি গেল। আজ ভোরে দাদাকে আর তার দুইজন সহকর্মীকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। মা ত সেই থেকেই কাঁদছেন। মুস্কিল হয়েছে এই বাবাও মফঃস্বলে গেছেন। এখন আপনি সাহায্য না করলে আমাদের আর কোনও উপায় নেই।"

সুবীথির স্বর ভগ্ন হইয়া আসিল।

বীরবল সুবীথির সহিত ভিতরে গেল। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের একটি মহিলা পরিত্যক্ত বস্ত্রস্তূপেরও মত একপাশে পড়িয়াছিলেন। বীরবল বুঝিল ইনি বীরব্রতের জননী। সমস্ত দিন কাঁদিয়া চক্ষু ফুলিয়া গিয়াছে, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো পড়িয়া আছেন, মুখ চোখ দেখিয়া মনে হয় এখনো আহার হয় নাই।

তার মন দুঃখে অভিভূত হইল। এদের অসহায় অবস্থা কল্পনা করিয়া সান্ত্বনার কোন ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না।

সুবীথি ডাকিল—"মা, বীরবলবাবু এসেছেন। ইনি দাদার বিশেষ বন্ধু।"

বিশেষ কথাটির উপর সুবীথি একটু জোর দেওয়ায় বীরবলও মনের সর্বাঙ্গে যেন কি এক মধুর আবেশে সিক্ত হইয়া গেল।

বীরব্রতের জননী ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বীরবলের হাত দুটি ধরিয়া ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে বলিল—"দেখ বাবা, আমাদের কি সর্বনাশ হোল। আমি একা মেয়েমানুষ কি বিপদে পড়েছি। বাছাকে আমার পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। সমস্ত দিন নিশ্চয়ই তার খাওয়া দাওয়া হয় নি।"

বলিতে বলিতে আবার কান্নায় ফাটিয়া পড়িলেন।

আকস্মিকতার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া নিয়া বীরবল জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় নিয়ে গেছে, জানেন কি?"

সুবীথি বলিল—"সুত্রাপুর থানায়। দাদা কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞাসা করায় তারা বলেছিল আপাতত সুত্রাপুর থানায়।"

বীরবল এই নারী দুটির অসহায় অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতিতে দ্রব হইয়া গেল। সুবীথি দাদার সঙ্গে যতই দেশোদ্ধারের পরামর্শ করুক, মেয়েমানুষ ত?

সে হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল—"আপনারা কিছু ভাববেন না। আমি এখনি যাচ্ছি। যেমন করে পারি আজ রাত্রেই বীরব্রতবাবুকে আপনার কাছে নিয়ে আসব।"

জননী কম্পিত ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন—"ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন। তোমার এই উপকারের ঋণ আমরা জীবনে ভুলব না।"

সুবীথি শুধু পূর্ণদৃষ্টিতে বীরবলের মুখের দিকে তাকাইল। চোখের কোণে দুইবিন্দু অশ্রু চিক্ চিক্ করিতেছে, দৃষ্টিতে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা।

[তেরো]

সে রাত্রে বহু ঘোরাঘুরির পর সহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জামিনস্বরূপ নিয়া বীরবল যখন থানায় আসিল তখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা।

ভদ্রলোককে একটু বসিতে বলিয়া সে বীরব্রতের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। দেখা করা কি সহজ ব্যাপার! একজন কনষ্টেবল বলিল—"আভি মুলাকাৎ নেহি হোগা। কাল ফজিরমে আইয়ে।"

বীরবল একটু অনুনয়ের স্বরে বলিল—"দেখা করা যে বিশেষ দরকার দারোগাবাবু, একটু দয়া আপনার করতেই হবে।"

কনষ্টেবলের মন একটু ভিজিল, দারোগাবাবু সম্বোধনে মনে মনে একটু গর্বিতও হইল। তার যেমন চেহারা তাতে তাকে ত দারোগা-বাবুর মতই দেখা যায়।

বীরবলকে বসিতে বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল, বোধহয় দারোগার কাছে। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আপ্ আইয়ে বাবুজী! আপকো বড়বাবু বোলায়া।"

কনষ্টেবলের সঙ্গে কতকটা ভিতরে গিয়া তার নির্দ্দেশানুযায়ী একটি ঘরে বীরবল ঢুকিল। কাঠখোট্টা চেহারা এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক বাজর্খায়ী গলায় বলিল—"বসুন।"

আওয়াজের বহরে ও নীরসতায় সে অনুমান করিল যে এই দারোগা। স্কন্ধদেশে S.I. মার্কা দেখিয়া বুঝিল যে তার অনুমান সত্য।

একটা ফাঁকা আওয়াজের মত শব্দ হইল—"কি চাই?"

বীরবল মনে মনে ঘামিয়া উঠিল। এখানকার চারিদিকের আবহাওয়া এমন থমথমে যে মানুষ এখানে আসিলেই সহজভাবে

কথাবার্ত্তার সুর হারাইয়া ফেলে। কিরকম একটা গুমোট গুরুভাব সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর ভারী হইয়া চাপিয়া বসে। চোর, ডাকাত, বদমায়েস ও খুনে ছাড়া মানুষের যে অন্য কোন রূপ থাকিতে পারে, এখানকার প্রভুরা তাহা ভুলিয়া যায়। বিশেষতঃ জীবনের বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে ভাব বিনিময়ে মনের যে প্রসারতা লাভ হয়, সাহিত্য ও কাব্যালোচনার ভিতর দিয়া মানুষের মনকে যে উন্মুক্ত উদারতার আস্বাদ দেয়, ইহারা সে সব সভয়ে বহুদূর থেকে পরিহার করে। বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট বিশ্বের মত এ যেন শয়তানে একটি নিখুঁত পৃথক সৃষ্টি।

মনে মনে বহুবার আওড়াইয়া আসিলেও বীরবলের বক্তব্য সে গুছাইয়া বলিতে পারিল না। আমতা আমতা করিয়া কোনমতে বলিল—"আজ্ঞে আমার এক বন্ধু বীরব্রত হাজতে আছে। তার জামীনের জন্য আপনার কাছে এসেছি। দয়া করে—"

দারোগা ধমক দিয়া উঠিল—"তার জন্য এই রাত দুপুরে এসেছেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? কখন তাকে এখানে আনা হয়েছে?"

বীরবল শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"আজ্ঞে আজ ভোরে।"

দারোগা ভেঙ্‌চাইয়া বলিল—"আজ ভোরে! আর আপনি এসেছেন জামীনের জন্য রাত বারোটায়! একি মামাবাড়ীর আব্দার পেয়েছেন নাকি?"

অপমানে বীরবলের কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল। এই কি মানুষের সঙ্গে মানুষের বাক্যালাপ? অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—"আজ্ঞে, কি করব, ওকে যখন ধরে নিয়ে আসে, বাড়ীতে ওর মা এবং বোন ছাড়া আর কেউ ছিল না। সন্ধ্যার পরে আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছি তাই—"

দারোগা এতক্ষণে বীরবলের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল, তারপর ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"আপনি সেখানে কেন গেছলেন ?"

বীরবল সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আজ্ঞে, আজ্ঞে আমরা এক কলেজে পড়ি কিনা তাই একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করতে গেছলাম।"

দারোগার মুখ কঠিন হল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার নাম ?"

বীরবল উত্তর করিল—"শ্রীবীরবল দত্ত।"

দারোগা—"হুঁ, বীরবল দত্ত। আপনি আর কোনদিন এদের বাসায় গেছেন ?"

বীরবলের মুখ শুকাইয়া গেল—"তা, তা, দু'একদিন—এমনি বেড়াতে—"

দারোগার গর্জ্জনে বীরবলের কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। সে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"হ্যাঁ বেড়াতে গেছলেন, না শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচন করতে গেছলেন ? ভারতমাতার দুঃখদুর্দ্দশায়, আপনাদের চোখ ফেটে জল পড়ে, হৃদয় রক্তাক্ত হয় আরও না কি কি হয় ?" তারপর একটু থামিয়া বলিল—"দেখুন আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবেন না। বলুন ত সত্যি করে কাল রাত্রে আপনাদের কোন মিটিং ছিল কিনা ওদের বাড়ীতে ?"

বীরবল দিশাহারা হইল। এবার সে বুঝিতে পারিল তার বিপদ। আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল—"আজ্ঞে আমি ত কোন মিটিংএর কথা জানি না। আমি আমার নিজের দরকারেই গেছলাম।"

দারোগা হুঙ্কার দিয়া বলিল—"তার বিচার কাল হবে। আজ আপনাকেও আমরা ছাড়ছি না! এই কোই হায়, ইস্‌কো হাজত মে লে যাও।"

এবার বীরবল চক্ষে সরিষাফুল দেখিল। কোনমতে উদ্গত অশ্রু চাপিয়া বলিল—"আমাকে? আমার কি অপরাধ?"

দারোগা উত্তেজিতভাবে বলিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাকে? দেশোদ্ধার করছেন না? যত সব ডেঁপো ছেলে, বাপের পয়সায় কলেজে পড়ে ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াবে? বুঝলে হে ছোকরা। আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাই না, আমাদের চোখ কান দুইই খোলা থাকে।"

বীরবল বিহ্বলভাবে দারোগার দিকে তাকাইয়া তারপর বলিল—"আমি যে জামীনের জন্য এক ভদ্রলোককে বাইরে বসিয়ে রেখে এসেছি।"

কনষ্টেবল আসিয়া গ্রেপ্তারের উপক্রমেই দারোগা কি ভাবিয়া বলিল—"আগারি বাহারমে এক ভদ্রলোক বৈঠা হ্যায় উস্‌কো বোলাও।"

কনষ্টেবল চলিয়া গেলে বীরবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া কনষ্টেবল প্রবেশ করিল। দারোগা তার দিকে না তাকাইয়াই কর্কশকণ্ঠে বলিল—"বসুন।"

ভদ্রলোক বসিতেই বলিল—"আপনারা কি ভেবেছেন বলুন ত? দিন নাই, রাত্রি নাই—"হঠাৎ তাকাইয়া অর্ধপথেই দারোগা থামিয়া গেল, মুখের ভাবও আশ্চর্য্যরকমে পরিবর্তিত হইয়া গেল। সসব্যস্তে ও সসম্ভ্রমে উঠিয়া নমস্কার করিল, মুখে বিনয়, সৌজন্য ও আপ্যায়নের শুষ্ক হাসি।

ভদ্রলোকও তাকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন—"কি হে তুমি দেখছি এখানে, কদ্দিন এ থানায় আছ?"

দারোগা—"আজ্ঞে একবছর।"

ভদ্রলোক—"কাজকর্ম্ম কি রকম চলছে?"

দারোগা—"এই কোন রকম। তবে আজকাল এই স্বদেশী ছোঁড়াদের নিয়ে বড় হ্যাসাঙ্গ। তা আপনি এখানে কবে এসেছেন?"

ভদ্রলোক—"আমি আজ প্রায় দু'বছর হল রিটায়ার করেছি। সেই সময় থেকে ত এখানেই আছি।"

দারোগা—"আপনাকে ধরে আনল কি করে? হাজতে যে ছেলেটি সে কি আপনার আত্মীয়?"

ভদ্রলোক—"আরে না, না। যে ভদ্রলোক আমাকে ধরে এনেছেন, তিনি একজন বিশিষ্ট কর্মী লোক, জগন্নাথ কলেজ ইউনিয়নের জেনেরাল সেক্রেটারী। এবার যে ঢাকায় একটা Inter Provincial Sports হচ্ছে ইনি তারও প্রধান উদ্যোক্তা। সেই সূত্রেই এর সঙ্গে আমার আলাপ। জানই ত এক সময়ে আমি একজন ভাল Sportsman ছিলাম।"

দারোগা—"তাই এত রাত্রে আপনাকে ধরে নিয়ে এসেছে। ছিঃ, ছিঃ, আপনাকে ত হয়তঃ বাইরে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে।"

দারোগার এত আপ্যায়নের মূলে সামান্য একটু ইতিহাস আছে। ইনি যখন মফঃস্বলের এক থানায় A. S. I. তখন Inspector কোনও কারণে এর উপর খুব চটেন। তার রিপোর্টে এর হয়তঃ চাকুরীও যাইত। সে সময় পুলিশ সাহেব ছিলেন একজন বাঙ্গালী। এই দারোগা তার বাংলোয় যাইয়া তার কাছে সব কথা খুলিয়া বলে এবং এও বলে যে তার বিরুদ্ধে যে সব রিপোর্ট গিয়াছে সবই Inspector এর আক্রোশ জনিত। পুলিশ সাহেব এর প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করেন এবং সেই থেকেই একে একটু বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহের চক্ষে দেখেন। ফলে পাঁচবৎসরের মধ্যেই ইনি S. I. হন। তারপর পুলিশ সাহেব অন্যত্র বদলী হইয়া যান এবং এই দারোগা ও খোঁজ খবর প্রথম প্রথম

কিছুদিন নিলেও শেষে নেওয়া ছাড়িয়া দেয়। এই ভদ্রলোকই সেই পুলিশ সাহেব। দু'বছর হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

ভদ্রলোক—"তাতে কি হয়েছে? তুমিও আর জানতে না যে আমি বাইরে বসে আছি? হ্যাঁ, আমি জামীন হলে এর বন্ধুকে ছাড়তে পার ত?"

দারোগা—"বিলক্ষণ, তার আর কথা কি? আপনি এক্ষুনি ওকে নিয়ে যান।" তারপর বীরবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"দেখুন, এসব পাগলামী ছাড়ুন। অনর্থক ভবিষ্যৎ জীবনটাকে নষ্ট করবেন না।"

ভদ্রলোক একটু আশ্চর্য হইয়া বীরবলের দিকে তাকাইতেই দারোগা বলিল—"আপনি বোধহয় জানেন না, এরা কয়জনে মিলে এদেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াবার ব্যবস্থা করছেন।"

এ সময় একজন কনেষ্টবল একখানা জামীনের form নিয়া ঢুকিল। ভদ্রলোক form খানা পূরণ করিয়া সই করিলেন, তারপর দারোগা ও বীরবল কাছ থেকে বিদায় নিয়া মোটরে উঠিলেন। দারোগাবাবু নমস্কারে আগাইয়া আসিল।

বদ্ধ থাকাত সবে মাত্র একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, দরজা খোলার শব্দে করিল। উঠিল। বীরবলকে দেখিয়া ত সে অবাক।

সুমিল শুধু বলিল—"বাড়ী চলুন, যেতে যেতে রাস্তায় সব

মস্তক আ"

নারীদের

বেশ লা

মনে বহ

নাসিকা

এসব প্রথা

[চৌদ্দ]

মিহির আজ দেশে আসিতেছে। কতদিন—কতদিন পর সে দেশে আসিবে। সুগভীর স্নেহে সুমিত্রাদেবীও একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ছেলে, বিলাতফেরৎ, কালীকিঙ্করবাবু সমগ্র বাড়ীখানা চুনকাম করাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইয়া রাখিয়াছেন। ছেলের যদি টেবিল চেয়ার ছাড়া খাইতে অসুবিধা হয়, একটা ঘরকে Dining Roomএ রূপান্তরিত করা হইয়াছে, কাটা চামচও একসেট আসিয়াছে। জলপূর্ণ ঘট, আম্র-পল্লব, দধি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সমস্ত প্রস্তুত।

বাড়ী থেকে ষ্টীমার ষ্টেশন এক মাইল। ছেলের হাটিয়া আসিতে কষ্ট হইবে এইজন্য একখানা পাল্কী এবং ৮ জন বেহারাসহ কালীকিঙ্কর-বাবু নিজে প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্বে ষ্টেশনে গিয়াছেন। কতকাল পরে ছেলেকে দেখিবেন! মিহির এখন দেখিতে কি রকম হইয়াছে। কে জানে? খাটি বিলাতী পোষাক পড়া ছেলেকে তিনি । াছে। চিনিতে পারিবেন? স্নেহে, মমতায়, ভালবাসায় তার সমস্ত কানও সিক্ত হইয়া উঠিল। রূমীও

অপ্রত্যাশিতভাবে প্রত্যাশিত ষ্টীমার দূরে হুইসিল দিল। এই ধ্বনিতে চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, গ্রাম্যবধূর প্রবাসী এবং জন্য মন কাঁদিয়া উঠিল, বিদেশে চাকরীরত পুত্রের জন্য পি ।এর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। কত গৃহকে মিলনানন্দে ভরপুর করেন কত গৃহকে বিরহ ব্যথায় ব্যাকুল করিয়া সেই ধ্বনি দূর দিগন্তে খেন। গেল। কালীশঙ্করবাবুর বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। ব্যাকুল াহেব অন্ধ আবেগে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ তোলপাড় করিয়া তুলিল প্রথম

বেহারারা শূন্য পাল্কী নিয়া আগেই ফিরিয়া আসিয়া খবর দিয়াছে। পাড়ার বহু মেয়ে ও বধু আসিয়া জড় হইয়াছেন। মিহির বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই বহু নারী কণ্ঠের সম্মিলিত হলুধ্বনি তাকে অভ্যর্থনা করিল।

সুমিত্রাদেবী আসিলেন—সেই আগেকার মত চওড়া লাল পেড়ে সাড়ী পরা, কপালে মস্ত বড় এক সিঁদুরে ফোঁটা, স্মিতপ্রসন্ন হাস্যে—পুত্রের দিকে আগাইয়া আসিলেন। মিহিরের মনের সর্বাঙ্গ স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপে জুড়াইয়া গেল, অতীত, ভবিষ্যৎ ভুলিয়া তার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া শুধু বর্তমান রহিল তার এই মমতাময়ী, শুচিস্মিতা, দেবীস্বরূপিনী মা।

মিহির লুটাইয়া নমস্কার করিল। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের শেষ বয়সে সন্তান হইলে তার সুদীর্ঘ জীবনের অতৃপ্ত স্নেহ ও ভালবাসা যেমন অকস্মাৎ উদ্দাম বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া সন্তানের উপর লুটাইয়া পড়ে, বহুদিন যুক্তকরে নমস্কার ও করকম্পনে অভ্যস্থ থাকায় মিহির এই নমস্কারে আপনাকে লুটাইয়া দিল। দীর্ঘদিন বিধি নিয়মের নাগ পাশে বদ্ধ থাকায় তা থেকে এই মুক্তিকে মিহির সানন্দে অভিনন্দিত করিল।

সুমিত্রাদেবী মিহিরের মাথায় ধানদূর্বা দিলেন, হাত ধরিয়া উঠাইয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, কপালে দইয়ের ফোঁটা দিলেন, তারপর সমবেত নারীদের দ্বিগুণীকৃত হলুধ্বনির মধ্যে ঘরে নিয়া গেলেন। মিহিরের বেশ লাগিল। বিলাতে থাকিতে দেশের এই সব প্রথাকে সে মনে মনে বহুবার কুসংস্কার বলিয়াছে, অসভ্যতার নিদর্শন বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছে, তারপর বহুদিন বাংলার বাইরে থাকায় এসব প্রথার অস্তিত্বই সে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ! আজ তার

মনে হইল বিলাতী বাহিক শুষ্ক শিষ্টাচারের মধ্যে মনের স্পর্শ কোথায়, হৃদয়ের সহানুভূতি কোথায়? দম দেওয়া কলের পুতুলের মত সে শুধু যথা সময়ে যথা নিয়মে অঙ্গভঙ্গী করে মাত্র।

দেশীয় প্রথার আন্তরিকতার স্নেহস্পর্শে মিহিরের সমস্ত হৃদয় সিক্ত হইয়া গেল। ঘরে গেলে দেখে সেখানে ছোট্টখাট একটি মহিলাব্যূহ। নানা বয়সে নানা পোষাকে বোধ হয় গ্রামের প্রায় সমস্ত মহিলারা একত্রিত হইয়াছেন।

কাপুরুষতা যেমন সংক্রামক, লজ্জাও বোধ হয় তেমনি। নইলে কুড়িথেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত সম্পূর্ণ এবং অর্ধ অবগুণ্ঠিতা এতগুলি সলজ্জ নারী সমাগমে মিহির নিজেও লজ্জাবোধ করিবে কেন? চকিতে একবার তাকাইয়া দেখে ঘোমটা ঈষৎ তুলিয়া অনেকেই তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

মহিলারা আস্তে আস্তে বিদায় নিলেন। প্রবীনারাও আশ্বস্ত হইয়া গেলেন যে বিলাত গিয়াও মিহির সাহেব বনিয়া যায় নাই, বা মেম সঙ্গে করিয়া আনে নাই।

এতক্ষণে মিহির হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল—"মা, তুমি কেমন আছ?"

আগেকার মত এই মা ডাকে সুমিত্রাদেবীর হৃদয়ে স্নেহসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। ছেলের বিরুদ্ধে কত অভিযোগ, কত নালিশ জমা হইয়াছিল, বিলাতী মেম এবং মাদ্রাজী মীরার সম্মোহনী ছলনায় ছেলের সম্বন্ধে কত দুশ্চিন্তা, কত আশঙ্কা তিনি ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। এই মা ডাকের ভিতরের প্রাণস্পর্শী আন্তরিকতায় সে সমস্তই অতিমাত্রায় তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর মনে হইল।

ছেলের কাছে বসিয়া তার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে

করিতে তিনি বলিলেন—"খোকা, তুইত অনেক শুকিয়ে গেছিস্। শরীরের যা হাল হয়েছে, পেটভরে খেতিস না বুঝি ?"

মিহির হাসিয়া বলিল—"সেকি মা! আমার শরীর ত আগের চেয়ে অনেক ভাল আছে। আমার বয়সের লোকের সাধারণতঃ যা ওজন থাকে, আমার ওজন ত তার চেয়ে অন্ততঃ দ্বিগুণ।"

সুমিত্রাদেবী ছেলের সর্বাঙ্গে একবার কল্যাণভরা দৃষ্টি বুলাইয়া নিয়া বলিলেন—"থাক্ থাক্ আর বাহাদুরী করতে হবে না। ওজন বেশী হলেই বুঝি শরীর ভাল থাকে। নিশ্চয়ই তুই অনেকখানি শুকিয়ে গেছিস্।"

মিহির জানিত সন্তান সম্বন্ধে স্নেহপ্রবণ মার এ দুর্বলতা তর্ক বা প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। তাই সে প্রত্যুত্তরে বলিল—"তোমারও ত মা শরীর ভাল নেই। আগের চেয়ে অনেক রোগা এবং অনেক বুড়ো দেখাচ্ছে।"

সুমিত্রাদেবী হাসিয়া বলিলেন—"শোন পাগল ছেলের কথা। আরে তোর মা কি কোনদিন বুড়ো হবে না, তার কি বয়স বাড়ে না ? তুই অতটুকুন থেকে অতবড়টি হয়ে গেলি, আর তোর মা যেমন ছিল তেমনি থাকবে ?"

মিহির বলিল—"তা মা তুমি যাই বল, তোমার শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছে।"

সুমিত্রাদেবী হঠাৎ ব্যগ্রভাবে বলিলেন—"থাক্, থাক্, মার শরীরের জন্য চিন্তা পরে হবে। এখন তুমি ওঠত, স্নান টান করে এসে কিছু খেয়ে নাও। তুমি ত আবার সাহেব মানুষ, ততক্ষণ এক কাপ চা দেব।"

মিহির প্রাতরাশ ষ্টীমারেই সারিয়া আসিয়াছিল। কাজেই বলিল—"না, এখন চা খাব না, তুমি বরং বাথরুমে জল দিতে বল।"

হইয়া উঠিয়াছে। পিতাকে সে আর পপি বলে না, বব্‌কাটা চুল এখন পৃষ্ঠবিলম্বিত, সাড়ীর ভাঁজ তার সর্বাঙ্গে বঙ্গ মহিলার মত নিখুঁতভাবে লোপটাইয়া থাকে।

উমা হয় ত শিবকে পাইবার জন্ম কঠোর তপাশ্চর্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই যে নারী লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে তিলে তিলে পলে পলে বিসর্জন করিয়া নিজের আজন্মের অভ্যাস, নিজের শিক্ষা দীক্ষা, সাধনা বাসনা সমস্ত ভুলিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন আবেষ্টনীর উপযোগী করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে, তার স্বার্থত্যাগের, তার আত্মত্যাগের তুলনা কোথায়?

মিঃ মেয়ন এ সমস্তই দেখিতেন জানিতেন এবং মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেন—"হে ভগবান্, দুঃখিনী মা-হারা এই মেয়ে জীবনে যেন দুঃখ না পায়। তার সমস্ত সাধনা, সমস্ত তপশ্চর্যা যেন সার্থক হয়ে উঠে।"

তাই পরিপূর্ণরূপে ভারতীয় নারী মীরা যখন আবার বিলাত যাইতে চাহিল, তখন সেটা যে কত দুঃখে, কতখানি আশাভঙ্গের পর, ইহা ভাবিয়া মিঃ মেয়ন দুঃখে বেদনায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন।

কি বলিলেন তিনি মীরাকে? কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন তার সর্বহারা অভাগিনী এই কন্যাকে? তিনি শুধু ভগ্নস্বরে বলিলেন—"তবে যাব মা। তার আগে চল আমরা ভারতবর্ষটাকে একটু ঘুরে দেখি।"

মীরা তাড়াতাড়ি বলিল—"তবে তাই চল বাবা! এস কালই আমরা বেড়িয়ে পড়ি।"

মিঃ মেয়ন বুঝিলেন মীরা আর একদিনও এখানে থাকিতে চায় না। তিনি তার পরদিনই বাহির হইয়া পড়া স্থির করিলেন।

রওনা হইবার পূর্বে মিহিরের শতস্মৃতিবিজড়িত এই স্থান পরিত্যাগ করিতে মীরার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল, সে যেন দ্বিতীয়বার মিহিরের বিচ্ছেদ জ্বালায় কাতর হইয়া উঠিল। মিহির যে এই বাড়ীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। ঐ বিলাতী পামের নীচে তাহারা পাশাপাশি বসিয়া কত নীরব সন্ধ্যা মধুময় করিয়া তুলিয়াছে, ঐ ডালিয়া ফুলের গাছ থেকে কতদিন ফুল ছিঁড়িয়া মিহিরের কোটে গুঁজিয়া দিয়াছে, কতদিন মিহির তার চুলে পড়াইয়া দিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে মীরার সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় নিঃসাড় হইয়া মনের অবচেতন কোণে শুধু জাগিয়া রহিল মিহিরের স্মৃতিমধুময় দিনের কলগুঞ্জন ধ্বনি।

মিহির যদি ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে না দেখে? যদি এই বাড়ীতে আসিয়া নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া যায়? যদি মায়ের মনোনীত মেয়েকে [illegible] করিতে তারই জন্য ছুটিয়া আসে? মীরার সমস্ত মুখ দুর্ভাবনার আশঙ্কায় পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল।

তাই ত তবে কি সে যাওয়া বন্ধ করিবে? না, তাহা অসম্ভব। নিজেই গরজ করিয়া যাওয়ার এত সব ব্যবস্থা করিবার পর এখন যাওয়া বন্ধ করা যাইতে পারে না।

মীরা ভাবনা সাগরে ডুবিয়া গেল। কোথায় গেল তার জিনিষপত্র গুছানো, কোথায় গেল তার রওনা হইবার অন্যান্য বন্দোবস্ত করা।

মিঃ সেন আসিয়া দেখেন কন্যা স্তূপীকৃত জিনিষপত্রের মাঝখানে বসিয়া গভীর চিন্তামগ্ন—সব চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো। তিনি ডাকিলেন—"ওকি মীরা এখনো দেখছি, কোন বন্দোবস্তই হয় নি। ট্রেণের যে আর দু'ঘণ্টা দেরী।"

মীরার চমক ভাঙ্গিল। সদ্য নিদ্রোত্থিতের বিহ্বল দৃষ্টিতে পিতার দিকে তাকাইল।

এক মুহূর্ত্তে সেই দৃষ্টির অর্থ মিঃ মেয়নের নিকট জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। কন্যার মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত দুঃখ তার চক্ষুর সম্মুখে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। বুঝিলেন মিহিরের এই অত্যন্ত সুস্পষ্ট স্মৃতিভরা গৃহ ত্যাগ করিতে মীরার কষ্ট হইতেছে।

কিন্তু মিহিরকে ত মীরার ভুলিতেই হইবে। মিহিরের স্মৃতি অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া না গেলে তার কন্যার জীবনে সুখের সম্ভাবনা নাই। অকৃতজ্ঞ, প্রতারক সে বিবাহ করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে জীবন যাপন করিবে, আর তার কন্যা আজীবন তার স্মৃতি বহন করিয়া নিষ্ফল দুঃখময় জীবনভার বহন করিবে?

না, গোড়াতে মীরার যতই কষ্ট হউক, চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুর বন্যা নির্গত হউক, হৃদয় ব্যথায় ও বেদনায় শতধা বিদীর্ণ হউক, এ আবেষ্টনী থেকে তাকে সরাইতেই হইবে, মিহিরকে না ভুলিলে ত মীরার চলিবে না।

মিঃ মেয়ন চাকর ডাকিয়া নিজেই সব গুছাইতে লাগিয়া গেলেন। মীরা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত দুর্বলতা ও শিথিলতা মন থেকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া পিতাকে বলিল—"থাক্ বাবা, তুমি যাও। তোমার আর এ সব করতে হবে না। আমি আধ ঘণ্টার ভিতর সব ঠিক করে আসছি।"

মিঃ মেয়ন নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যে, পিতা পুত্রী ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন। কোথায় যাওয়া হইবে তা সেখানে যাইয়া ঠিক হইবে।

[ষোল]

রাস্তায় চলিতে চলিতে বীরবল বীরব্রতকে সমস্ত বলিল। কিরকমভাবে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মহীতোষ বাবুকে অনুরোধ করিয়া থানায় নিয়া গেল, তিনি না থাকিলে হয়তঃ আজ তাকেও হাজতে কাটাইতে হইত ইত্যাদি।

সমস্ত শুনিয়া ক্রোধে বীরব্রতের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিতভাবে বলিল—"কেন ভাই তুমি আমার জন্য ওরূপ অপমান বরণ করতে গেলে? এর চেয়ে যে হাজত ঢের ভাল ছিল?"

বীরবল বীরব্রতের এক নূতনরূপ দেখিল—মধ্যাহ্ন সূর্যের মত উগ্র ও দীপ্ত, কালবৈশাখীর ঝড়ের পূর্বাবস্থার মত শান্ত কিন্তু ভয়ঙ্কর।

বীরবল চুপ করিয়া রহিল যেন সে একটা মহা অপরাধের কাজ করিয়াছে।

বীরব্রত বলিয়া চলিল—"যে জাতি নিঃসাড়, প্রাণশক্তিহীন, পরাধীনতার জ্বালাবোধ করবার মত শক্তি পর্যন্ত যাদের লুপ্ত তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আর আমরা কি আশা করতে পারি?"

তারপর সহসা বীরবলের হাত ধরিয়া বলিল—"রাগ কোরো না ভাই। তুমি আজ যা আমার জন্য করেছ তা অন্যত্র দুর্লভ। তোমার ঋণ আমরা আজীবন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব! বুঝতেই ত পার যখন ভাবি, যাদের উন্নতির জন্য, যাদের মঙ্গলের জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করেছি, তারাই প্রতিপদে প্রবল বাধার সৃষ্টি করছে, তখন মানসিক অবস্থা কি রকম হয়? এক একবার ভাবি দেশ তার অগনিত আবর্জনাস্তূপসহ ধ্বংশের অতলগর্ভে তলিয়ে যাক।"

বীরবল ধীরে ধীরে বলিল—"এ সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার আমার এখনো জন্মে নাই। তবে এটুকু মনে হয়, পরাধীনতার সব চেয়ে বড় অভিশাপই এই। স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় সবাই যদি একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কেউ কোন বাঁধার সৃষ্টি না করে, তবে ত সে দেশ এক মুহূর্ত্তও পরাধীন থাকতে পারে না।"

বীরব্রত কিছু বলিবার পূর্বেই উভয়ে তাদের বাড়ীর দরজায় আসিয়া পৌছিল। ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে উত্তর আসিল—"কে?"

"আমি বীরুবল, দরজাটা একটু খুলুন।"

"বীরবলবাবু, এত রাত্রে? ব্যাপার কি? দাদার কোন খবর পেলেন?" বলিতে বলিতে দরজা খুলিয়া গেল।

বীরব্রত একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। সুবীথি চমকিয়া বলিল—"কে? ওখানে কে দাঁড়িয়ে? কে দাদা? মা, মা, শীগগীর ওঠ, দাদা এসেছে।"

সুবীথি ছোট বালিকার মত কলরব করিয়া উঠিল। আনন্দে, স্ফূর্তিতে, উচ্ছ্বলতায় সে যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। দাদাকে যেন সে দশ বছর পরে দেখিয়াছে।

বীরব্রত পরমস্নেহে এই মমতাময়ী বোনটীর দিকে তাকাইল। গোলমালে বীরব্রতের মা হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ব্যগ্রব্যাকুল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে, কে, কে রে বীথি, কে?"

সুবীথির আনন্দের উত্তেজনা তখনো কাটে নাই। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দাদাকে ধরিয়া মার সম্মুখে টানিয়া আনিল। কলকণ্ঠে বলিল—"দেখ ত মা কে? আরে, ওরকম করে তাকিয়ে আছ কেন? ও যে দাদা! দাদা এসেছে।"

মা অশ্রু বিজড়িতকণ্ঠে বলিলেন—"কে, বীরু এলি? ভগবান তবে

মুখ তুলে চেয়েছেন। আমি যে তোর মঙ্গলের জন্য তাকে মনেপ্রাণে কত ডেকেছি।"

তারপর স্নেহসিক্ত দৃষ্টি ছেলের সর্বাঙ্গে একবার বুলাইয়া নিয়া বলিলেন—"হ্যারে, তোকে এতক্ষণ কোথায় আট্‌কে রেখেছিল? না জানি সমস্ত দিন কত কষ্ট পেয়েছিস।" বলিতে বলিতে কান্নায় গলার স্বর আটকিয়া আসিল।

সুবীথি বলিল—"মা, তুমি আবার কাঁদতে সুরু করলে? দেখ দাদা, মা আজ সমস্ত দিন কিছু খায় নি, শুধু কেঁদেছে।"

সুবীথির শুষ্ক মুখের দিকে তাকাইয়া বীরব্রত বুঝিল যে তার পেটেও সমস্তদিনে কিছু পড়ে নাই। একটু হাসিয়া বলিল—"আর তুমি!"

বীরবলের সম্মুখে এই দুর্বলতা প্রকাশ হইতে দেখিয়া সুবীথি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল—"মা, এদের খেতে দেবে না। এখনো যে কারও খাওয়া হয় নি।"

মা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। কাছে গিয়া বীরব্রতের গায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"আহা, বাছার মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। পুলিশের লোকগুলো কি নিষ্ঠুর। সমস্ত দিন এই শিশুকে না খাইয়ে রেখেছে।"

বীরব্রত হাসিয়া বলিল—"তোমার উনিশ বছরের এই জোয়ান ছেলেকে শিশু মনে করলে তারা হয়তঃ ফিডিং বোতলে দুধের ব্যবস্থা করত। তা যা হোক, এখন চাট্টি খাবার ব্যবস্থা কর।"

মা দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। বীরব্রত, বীরবল ও সুবীথিকে নিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

সুবীথি দাদার নিকট সমস্ত শুনিল। বীরবলের উপর কৃতজ্ঞতায় তার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বলিল—"বীরবলবাবু, আপনার

ঋণ আমরা এ জীবনে শোধ করতে পারব না। দাদা, ভাগ্যিস বীরবল-বাবু সন্ধ্যার পর এসেছিলেন!"

বীরব্রত বলিল—"সত্যি বীরবলবাবু, আপনি আজ যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, তা কেউ আপনার জনের জন্যও করে না। মা ত সব জানতে পারলে আপনাকে নিয়ে যে কি করবেন, তা নিজেই ঠিক করতে পারবেন না।"

সুবীথি কৃতজ্ঞতা ভরাকণ্ঠে বলিল—"বাস্তবিক দাদা, আজ বীরবল-বাবু না থাকলে কি যে হোত! তুমি সমস্ত রাত্রি না খেয়ে হাজতে কাটাতে আর মা সমস্ত রাত্রি অনাহারে কেঁদে কাটাতেন।"

সুবীথির কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টি ও মমতা ভরা কণ্ঠ বীরবলের বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া তুলিল। তার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে হইল।

কেমন যেন অপ্রস্তুত ও আরক্তিম হইয়া বলিল—"না, না, এ আর এমন কি, এ ত মানুষ মাত্রেই মানুষের জন্য করে থাকে। বিশেষতঃ বীরব্রতবাবু আমার একজন বিশেষ বন্ধু।"

এমন সময় খাবার ডাক পড়িল। বীরবল বলিল—"আমি তবে এখন হোষ্টেলে ফিরে যাই। রাত্রি ত প্রায় শেষ হয়ে এল।"

সুবীথি বলিল—"সে কি বীরবলবাবু! আজ আর আপনার হোষ্টেলে কিছুতেই যাওয়া হবে না। আজ খেয়ে দেয়ে এখানে শুয়ে থাকবেন। কাল ভোরে চা খেয়ে তারপর যাবেন।"

বীরব্রত বলিল—"আমিও তাই বলি, তুমি আজ যেতে চেয়ো না। আর এত রাত্রে হোষ্টেলে ঢোকাও মুস্কিল হবে। ঐ যা; বীরবলবাবুকে তুমি বলে ফেল্‌লাম। দেখ ভাই কিছু মনে করো না। আমি বন্ধু বান্ধবদের বেশীদিন 'আপনি' 'আসুন' এসব সম্ভ্রমসূচক শব্দ ব্যবহার

করতে পারি না। ঐ আমার একটা মস্ত বদ্ অভ্যাস। দুদিন যেতে না যেতেই 'তুমি' বলে ফেলি।"

বীরবল তাড়াতাড়ি বলিল—"না, না, এতে আমি বরং খুবই খুসী হয়েছি। আমাকে যে আপনার জন মনে করে নিয়েছেন এত আমার সৌভাগ্য।"

বীরব্রতের মা এমন সময় ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"কই, তোমরা খাবে এস।"

সুবীথি বলিল—"মা, বীরবলবাবু হোষ্টেলে ফিরে যেতে চাচ্ছেন।"

মা বলিলেন—"সে কি হয়? আজ ত কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না। কাল একেবারে এখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে কলেজে যাবে।"

বীরব্রত হাসিয়া বলিল—"শুনলে ত? আর কথা বাড়িও না। তাতে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। চল, এখন খেতে যাওয়া যাক।"

বীরবল আর প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইল না।

খাইতে খাইতে বীরব্রত মার কাছে সব বলিল! বীরবল সম্বন্ধে কিছুই বাদ দিল না। শুনিয়া কৃতজ্ঞতায়, স্নেহে, মমতায়, তার চক্ষুতে জল আসিল। তিনি বীরবলকে বার বার এমন সব আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন যা যে কোন ভাগ্যবানের পক্ষে কল্পনাতীত।

এরূপ অস্বাদিত, অফুরন্ত প্রাণস্পর্শী ভালবাসার প্লাবনে বীরবল দিশাহারা হইয়া গেল। নারীস্নেহ কিরূপ অজস্র ও অযাচিত হইতে পারে, তার রসঘন পরিবেশ জীবনকে কতখানি সার্থক ও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে, মাতৃস্নেহ বঞ্চিত বীরবলের কাছে তার অপূর্ব আস্বাদন সম্পূর্ণ নূতন মনে হইল। মায়ের স্মৃতি তার জীবনে অস্পষ্ট

হইয়া আসিয়াছে, তাই অযাচিত স্নেহের এরূপ আন্তরিক অভিব্যক্তিতে তার সমস্ত মন এক অননুভূত ভাবাবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তাহারা সকলে খাবার ঘরে ঢুকিল।

[সতের]

পরদিন রাত্রি ৮টার সময় বীরব্রত আসিয়া উপস্থিত। বীরবল তখন সবে মাত্র বেড়াইয়া ফিরিয়াছে, তাকে দেখিয়াই বিপুল কলরবে অভ্যর্থনা করিল। বলিল—"আরে বীরব্রতবাবু যে! বসুন, বসুন, তারপর কি মনে করে?"

বীরব্রত বলিল—"এই বুঝি বেড়িয়ে ফিরলে? হাত মুখ ধুয়ে এসে সুস্থির হয়ে বস, তারপর বলছি।"

বীরবল—"আচ্ছা, একটু বসুন, আমি এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।" সে বাহিরে আসিয়া চাকরকে দোকান থেকে তাড়াতাড়ি দুই হু'কাপ চা আর কিছু মিষ্টি আনিতে বলিল।

তারপর হাত মুখ ধুইয়া তোয়ালে মুখ মুছিতে মুছিতে ঘরে ঢুকিল। বীরব্রত ততক্ষণে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা থেকে কি একটি কবিতা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়িতেছে।

বীরবল বলিল—"আপনি দেখছি কবিতাও পড়েন? এতে আপনাদের সংকল্প—কঠোর মনের দৃঢ়তা শিথিল হয় না? কি কবিতা পড়ছেন?"

বীরব্রত বলিল—"উর্বশী।"

বীরবল চমকিয়া বলিল—"উর্বশী?"

বীরব্রত গম্ভীরভাবে বলিল—"হ্যা, উর্বশী। এতে চমকিত হবার কি আছে? উর্বশী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় সাধনপ্রণালী সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।"

বীরবল বিস্ময়ে মুখব্যাদন করিয়া বলিল—"তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় সাধনপ্রণালী? উর্বশী কবিতায়? কি ব্যাখ্যাটা বলুন ত?"

বীরব্রত অম্লানবদনে বলিয়া চলিল—"তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালীতে তিনটি নাড়ীর উল্লেখ আছে জান ত? ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। এদের উর্দ্ধে হচ্ছে হলাদিনী বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তাই কবি বলছেন—'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ অর্থাৎ তুমি ইড়াও নও, পিঙ্গলাও নও, সুষুম্নাও নও। তুমি হৃদিশতদলবাসিনী হলাদিনী শক্তি অর্থাৎ উর্বশী। এই শক্তি প্রথম অবস্থায় সুপ্ত থাকে ত? তাই কবি বলছেন—অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল পালঙ্কে ঘুমাইতে কার অঙ্কটিতে।"

বীরবল হাসিয়া বলিল—"কালিদাসকে বাঙালী প্রমাণ করবার জন্য যেমন কেউ কেউ প্রবন্ধ লিখছেন, আপনিও সেরূপ একটি প্রবন্ধ লিখুন যে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবি নয়, তান্ত্রিক কবি। যাক্ ওসব কথা। আপনার আগমনের কারণটা জানিতে পারি কি?"

বীরব্রত বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—"তাই ত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নিমজ্জিত হয়ে সমাজ সংসার সবই যে ভুলে বসেছিলাম। মা, তোমাকে আগামী পর্শু রাত্রে আমাদের ওখানে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন।"

বীরবল জিজ্ঞাসা করিল—"হঠাৎ নিমন্ত্রণ!"

বীরব্রত বলিল—"আমার এক জ্যাঠামশায় বনবিভাগের অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি কন্‌সারভেটর, কলিকাতায় থাকেন। তিনি তার একমাত্র মেয়েকে নিয়ে আগামী কাল আমাদের বাড়ীতে আসবেন, এক আই,

সি, এস পাত্রকে মেয়ে দেখাতে। আই, সি, এস্ পুরুষ এবং তার রায় বাহাদুর পিতার জন্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থাও হবে। সেই উপলক্ষ্যে মা অমনি তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়ে দিলেন।"

চাকর এমন সময় ট্রেতে করিয়া দুই কাপ চা ও দু' প্লেট জলখাবার আনিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিল।

বীরব্রত আপত্তি করিতেই বীরবল বলিল—"সে হবে না। আজ একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে। আপনাদের ওখানে গেলেই ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করেন আর আমার এখানে একদিন একটু কিছু খাবেন না? না খেলে আমি কিন্তু খুব দুঃখিত হব।"

বীরব্রত আর আপত্তি করিল না। উভয়ে মিষ্টি আর চায়ের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল।

কথায় কথায় বীরবল জানিল যে বীরব্রতের এই জ্যাঠতুত ভগ্নিটির নাম দেবহূতি, সুবীথির চেয়ে দুই বৎসরের বড়। লরেটো থেকে ম্যাট্রিক পাশ করিলেও হিন্দুর প্রত্যেকটি সংস্কার তার জীবনের সঙ্গে গ্রথিত। মা একান্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-ঘরের মেয়ে, অথচ বাপ বিলাত ফেরৎ, বামুনের চেয়ে বাবুর্চির, পাঁঠার চেয়ে মুরগীর অধিকতর পক্ষপাতী। তাই দেবহূতির মধ্যে এই দুই প্রভাবের অদ্ভুত সমন্বয় হইয়াছে। সে যেমন চমৎকার পিয়ানো বাজায়, তেমনি চমৎকার গীতা পড়ে, যেমন হাই হিল জুতো পরিয়া লেকের ধারে বেড়াইতে যায়, তেমনি পট্টবস্ত্র পরিয়া মায়ের পূজার ফুল তোলে।

বীরবল বলিল—"এ বড় অদ্ভুত সমন্বয় তো। এ রকম ত বড় শোনা যায় না।"

বীরব্রত বলিল—"হ্যা, অনেকটা অদ্ভুতই বটে। কিন্তু এই সমন্বয় দেবহূতির চরিত্রকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। আশ্চর্য মেধা এই

মেয়েটীর। সতের বছর মাত্র বয়েস, এর মধ্যেই হিন্দুর সমগ্র উপনিষৎ আয়ত্ব করেছে, পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানও গভীর।"

বীরবল—"আপনার ভগ্নিটির সম্বন্ধে যা শুনলেম, তাতে আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছি। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে আমার মন আপ্লুত হয়ে উঠেছে।"

বীরব্রত উঠিতে উঠিতে বলিল—"আলাপ করে দেখবে, আরও চমৎকার লাগবে। আচ্ছা, এখন উঠি, রাত্রি ৯টা বেজে গেছে। পর্শু যেতে ভুলো না কিন্তু।

বীরবল—"না, নিশ্চয়ই ভুলব না। একে নিমন্ত্রণ, তদুপরি এরূপ একটি মহিলার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য। যাব আমি নিশ্চয়ই।"

বীরব্রত বিদায় গ্রহণ করিল।

[আঠার]

মিহির আসিয়া পৌছিবার পরের দিনটি সুমিত্রাদেবী স্বামীকে বলিলেন—"কই, মিহিরকে মেয়ে দেখতে যাবার কথা বললে না? যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।"

কালীকিঙ্করবাবু বলিলেন—"এতদিন ধরে সমস্ত কথাই ত তুমি বললে, মিছামিছি একটা বলার ভার আমার উপর চাপিয়ে দিতে চাও কেন? ও তুমিই বল।"

সুমিত্রাদেবী বলিলেন,—"তুমি কি কোনদিনই সংসারের কোন কাজে লাগবে না? আমি মরে গেলে কি হবে বলত?"

কালীকিঙ্করবাবু কণ্ঠে আবেগ মিশাইয়া বলিলেন—"সে দিনের কথা চিন্তা করতেও আমি মনে মনে শিউরে উঠি। সেদিন যদি কখনো আসে, তবে হয়ত শেষপর্যন্ত আমাকে সহমরণেই যেতে হবে। তুমি যে আমার জীবনের কতখানি—"

সুমিত্রাদেবী বাধা দিয়া বলিলেন—"থাক বুড়ো বয়সে এত রসের দরকার নেই। এখন ছেলেকে কিভাবে বলি বলত ?"

কালীকিঙ্করবাবু বলিলেন—"ও আর আমি কি বল্‌ব ? তুমি যে ভাবে ভাল বোঝ সেভাবে বল।"

সুমিত্রাদেবী—"আচ্ছা, তবে খোকাকে ডাকি। যা বল্‌বার তোমার সামনেই বলব।"

কালীকিঙ্করবাবু ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিলেন—"না, না, আমার সামনে আর কেন ? ও তুমি একাই জিজ্ঞাসা কর।"

সুমিত্রাদেবী—"না, সে হবে না। চিরটা কালই তুমি সংসারের সমস্ত কাজ এড়িয়ে চললে। আজ তোমায় থাকতেই হবে।"

কালীকিঙ্করবাবু বেশী প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইলেন না, কারণ স্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ করিতে তিনি মোটেই অভ্যস্ত নন। ফাঁসী কাঠের আসামীর মত মুখ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সুমিত্রাদেবী মিহিরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কালীকিঙ্করবাবু মনে মনে ভাবিতেছেন যে আচ্ছা শরীর হঠাৎ খুব অসুস্থ বোধ হইতেছে বলিয়া চেয়ার থেকে পড়িয়া গেলে কি রকম হয় ? না, তাতে হয়তঃ বেশী আঘাত পাবার সম্ভাবনা আছে। বুড়ো বয়সে হাত পা ভাঙ্গাও বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ সুমিত্রা যদি বুঝিতে পারে ! হয়তঃ সমস্ত দিন দুধ সাবু খাওয়াইয়া রাখিবে। আচ্ছা, যদি বলি যে ও পাড়ার দেবেনবাবুর বড় মেয়েটীর আজ ভোরে

হঠাৎ ভাস্তবমি আরম্ভ হইয়াছে, এইমাত্র খবর দিয়া গেল! এখনই না গেলে বিশেষ খারাপ দেখায় সুমিত্রা কি বিশ্বাস করিবে? যদি লোক পাঠাইয়া খবর নেয়।

নাঃ, কোন ফন্দী জুতসই মনে হইতেছে না। সুমিত্রাকে ঠকানো অসম্ভব। ভগবন যদি ওকে বুদ্ধি একটু কম দিতেন!

মিহির আসিয়া উপস্থিত হইল। কালীকিঙ্করবাবু মনে মনে ঘামিয়া উঠিলেন। বিবাহের সমস্যাটা যেন পরিপূর্ণরূপে তারই। হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া একটা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

সুমিত্রা বলিলেন—"খোকা, আর দেরী করে লাভ কি? পরশুই গিয়ে মেয়ে দেখে এস। আমি মেয়ের মাকে চিঠি লিখে দিয়েছি যে আপনারা তৈরী থাকবেন, আমাদের টেলীগ্রাম পেলেই মেয়েকে নিয়ে ঢাকা রওনা হবেন। ছেলে ঢাকা গিয়ে মেয়ে দেখে আসবে।"

মিহিরের মনের গোপন ক্ষতটা যেন আবার বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। ডাক্তারেরা যখন নিঃসংশয়ে বলিয়া যায় যে রোগী বাঁচিবে না তখন তার পিতামাতার মন সন্তানের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর জন্য যতই প্রস্তুত থাকুক, মৃত্যু বাস্তবিক যখন ঘটে তখন তাদের মন নূতন করিয়া আঘাত পাইবেই। মিহিরও এই দুর্নিবার দুর্ঘটনার জন্য মাদ্রাজ থেকে মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেও মায়ের এই কথায় ব্যথাটা নূতন করিয়া বোধ হইতে লাগিল। নূতন করিয়া মনে হইল মীরার বিষাদকাতর ম্লানমুখ, নূতন করিয়া মনে হইল তার ছলছল অশ্রুসজল দৃষ্টি।

তাছাড়া দূরত্বের বোধহয় একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, একটা ভাবোদ্বেলতা আছে, একটা সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট প্রভাব আছে

হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউসনের মত স্থূল প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ যত দূরত্ব দ্বারা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, ততই তার শক্তি বর্ধিত হয়, বহিরিন্দ্রিয় হইতে সরিয়া গিয়া অন্তরিন্দ্রিয়ে সে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাই মীরাকে ছাড়িয়া আসিয়া মীরার স্মৃতি মিহিরের মনে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, মার প্রত্যক্ষ অনুভূতিদ্বারা তার অপ্রত্যক্ষ অনিবার্য প্রভাব স্থূল হইয়া আসিয়াছে। মাদ্রাজে থাকিতে মার প্রভাব মীরার প্রভাবকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, আজ মীরার প্রভাব মার প্রভাবকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

মিহির বলিল—"এই সম্বন্ধই যদি তোমরা আমার জন্য সাব্যস্ত করে থাক, তবে আর আমার মেয়ে দেখায় প্রয়োজন কি ?"

কালীকিঙ্করবাবু বসিয়া বসিয়া নিজেকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত মনে করিতে লাগিলেন, যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকেই কেউ জোর করিয়া বিবাহ দেওয়াবার চেষ্টা করিতেছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের পাতায় তিনি আরও গভীরভাবে ডুবিয়া গেলেন।

সুমিত্রাদেবী বুঝিলেন এ ছেলের অভিমানের কথা। ব্যথিতকণ্ঠে বলিলেন—"খোকা তুমি আমাদের ভুল বুঝো না। তোমার পছন্দ না হলে জোর করে কোন মেয়েকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব, তুমি কি আমাকে এরকম ভাবতে পার? ওরকম করে বললে যে আমি আঘাত পাই। তুমি মেয়ে দেখে এস, তোমার বাস্তবিক পছন্দ না হলেও মেয়েকে বিয়ে করো না। বাংলা দেশে কি বিবাহযোগ্যা মেয়ের অভাব ?"

কালীকিঙ্করবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—"হ্যাঃ চল কালই আমরা মেয়ে দেখতে রওনা হই। পছন্দ না হয়, এ বিয়ে হবে না, এত সোজা কথা।"

এই কথা কয়টি বলিতে পাইয়া তিনি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

মিহির বলিল—"বেশ, তাই চল। মেয়ে যখন দেখতে হবেই তখন দেরী করে লাভ কি।"

সুমিত্রাদেবী বলিলেন—"আমি তোমাকে বলছি, এ মেয়ে তোমার পছন্দ হবেই। এমন চমৎকার দেখতে, এমন সুন্দর স্বভাব, এমন সরলতা ও মমতাভরা চোখ দুটী, আমি ত মুগ্ধ হয়ে গেছি। ওঁকে জিজ্ঞেস কর, ওঁর ও মেয়েটিকে খুবই ভাল লেগেছে।"

মিহির বলিল—"তোমাদের সকলেরই যখন এত ভাল লেগেছে, তখন আমার অপছন্দ হওয়াটাও ত অন্যায় হবে। তার চেয়ে আমি বলি দেখার কোন দরকার নেই, আমি অমনি মত দিচ্ছি, তোমরা দিন স্থির করে ফেল।"

সুমিত্রাদেবীর কণ্ঠে বেদনার সুর ধ্বনিত হইল। তিনি বলিলেন—"কেন মিছামিছি আমাকে ব্যথা দিচ্ছ? তুমি অসুখী হবে, তুমি দুঃখ পাবে, এ রকম কিছু করা ত আমি কল্পনাও করতে পারি না। বেশত, এ মেয়ে তুমি দেখতে যেয়ো না। তুমি নিজেই দেখে শুনে পছন্দ করে একটি মেয়েকে বিয়ে কর।"

মায়ের মনে কষ্ট দিয়াছে বলিয়া মিহিরও দুঃখিত হইল। সে তাড়াতাড়ি বলিল—"না মা, তুমি কষ্ট পাবে জানলে আমি ও কথা বলতাম না। আমি কিন্তু কথাটা ও ভাবে বলিনি! আমি বলতে চেয়েছিলাম যে তোমাদের দু'জনের যখন পছন্দ হয়েছে, তখন মেয়ের কোন ত্রুটি থাকতে পারে না, আমার দেখাটা অবান্তর। তা না দেখলে তুমি যখন দুঃখ পাবে, তখন বেশত পরশু ভোরেই আমরা ঢাকা রওনা হব।"

কালীকিঙ্করবাবু উঠিয়া বলিলেন—"তাই ঠিক রইল। পরশু ভোরেই আমরা রওনা হব।"

তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। সুমিত্রাদেবীও মেয়ের বাপকে তখনি টেলীগ্রাম করিবার জন্য তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন।

মিহির হতভম্বের মত বসিয়া রহিল। মীরার কথা ভাবিয়া তার ব্যথিত হৃদয় গভীর বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল। যূপবদ্ধ বলির পশুর মত তার সমস্ত মন করুণ আর্তনাদে ছটফট করিতে লাগিল।

[উনিশ]

জিতব্রতবাবুর বাড়ীতে আজ মহা হুলুস্থুলু ব্যাপার, ভোর থেকে সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত। হেরম্ববাবু গতকল্য মেয়ে দেবহূতিকে নিয়া আনিয়া পৌছিয়াছেন।

উকীলবাবু বৈঠকখানা ধুইয়া মুছিয়া পরিস্কার করা হইতেছে। কোণের আলমারীটার উপর পুরানো কাগজ-পত্র চাপা দিয়া রাখা হইয়াছে, একখানা ফরসা চাদর দিয়া সবটা ঢাকিয়া দেওয়া হইবে।

বীরব্রত বাহির হইয়া গিয়াছে, তার এক ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়ী থেকে একটা পিয়ানো ও একটা হারমনিয়ম যোগার করিয়া আনিতে। সুবীথি চাকরের সঙ্গে জগন্নাথ কলেজ হোষ্টেলে গেল বীরবলকে অবিলম্বে নিয়া আনিতে, কারণ তার দাদা একা সব ব্যবস্থা করিতে পারিয়া উঠিবে না। জিতব্রতবাবুর আজ একটা জরুরী মোকর্দ্দমার তারিখ, কোর্টে না গেলে চলিবে না।

বীরবল সবে মাত্র স্নান করিয়া খাইতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে

এমন সময় শুনিল নারীকণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"বীরবলবাবু এই হোটেলে থাকেন? কোন্ ঘরে? ও এই ঘরে। আচ্ছা ধন্যবাদ।"

বীরবল লাফাইয়া উঠিল। তাইত, এ যে সুবীথির কণ্ঠস্বর! তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল—"একি, আপনি যে! ব্যাপার কি?"

সুবীথি বলিল—"মা, আপনাকে এক্ষুনি যেতে বলেছেন! আজ কলেজে যাওয়া বন্ধ, জানেন ত, আজ দিদিকে দেখ্‌তে আসবে। দাদা একলা সব পেরে উঠ্‌বেন না, তাই আপনার জরুরী তলব হয়েছে।"

বীরবল—"তা আপনি কেন কষ্ট করে এলেন? চাকরকে একটা চিঠি দিয়ে পাঠালেই হোত?"

সুবীথি—"পাঠালাম না, যদি আপনি দেরী করেন। এক্ষুনি চলুন।"

বীরবল—"আপনি একটু দাঁড়ান। আমি চট্ করে জামাটা নিয়ে আসছি।"

বীরবল ঘরে ঢুকিতেই একটা কলরব উঠিল। কে একজন বলিল—"কিহে ভায়া, বেশ ত ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ। এ মাল জোটালে কোত্থেকে?"

আর একজন বলিল—"যাই বল ভাই, এর বাহাদুরী আছে। আমাদের প্রায় দু'বছর ত হয়ে এল, কই, কোন বান্ধবী জোটা দূরের কথা, একদিন কোন তরুণী একটু হেসেও কথা কৈল না। আর দাদা আমার ৪।৫ মাসেই বেশ জমিয়ে তুলেছে।"

তৃতীয় কণ্ঠ শোনা গেল—"তাই বীরবলবাবুর প্রায়ই রাত্রে ফিরতে দেরি হয়। বলি, আমাদের নেমন্তন্নের কদ্দূর?"

লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে সুবীথির মুখ ও কাণ লাল হইয়া উঠিল। ছিঃ, ছিঃ, এরূপ জঘন্য আবেষ্টনীতে বীরবলবাবু থাকেন? এরূপ নোংরা ইতরতা কি ভদ্রলোকের ছেলে করিতে পারে?

বীরবল এরূপ ইতর ইয়ার্কিতে অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে। কোন দিন নিজেও যে যোগ দেয় না এমন নয়। কিন্তু আজ তার নিজের অত্যন্ত খারাপ লাগিল। সুবীথি কি ভাবিতেছে? ইচ্ছা হইল এই জঘন্য ইতরতার জন্য এদের গালে ঠাস্ ঠাস্ চড় বসাইয়া দেয়। কোনমতে জামাটা গায় দিয়া বাহিরে আসিয়া সুবীথিকে বলিল—"চলুন।"

কে একজন গান ধরিল—"চলিল শ্যাম কুঞ্জবনে
রাধা সনে এ-এ-এ।"

কতকটা পথ আসিয়া সুবীথি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল—"বীরবলবাবু, এই আজকালকার কলেজের ছেলেদের নমুনা? আপনি এখানে থাকেন কি করে বলুন ত।"

বীরবল বলিল—"না থেকেই বা কোথায় যাব। তারপর এদেরও খুব দোষ দেওয়া যায় কি? স্কুল জীবনে অভিভাবকদের অধীনে এমন পরিপূর্ণ বর্দ্ধ আবহাওয়ায় ছেলেরা বেড়ে উঠে, যে কলেজের এই হঠাৎ অবাধ মুক্তির স্রোতে তাদের ভাসিয়ে নেবেই। অভাবিত স্বাধীনতার বিপুল প্লাবন যদি বদ্ধ জলার বাঁধ ভেঙ্গে দেয়, আবর্জনা তাতে কিছু প্রথম প্রথম থাকবেই কিন্তু সেটা তার স্থায়ীরূপ নয়। আলোড়ন মন্দীভূত হলেই আবর্জনা নীচে পড়ে যাবে, টলটলে নির্মল জল স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসবে।"

সুবীথি—"আমার ভয় হচ্ছে, কিছু কিছু আবর্জনা জলের সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে আবার অস্থি মাংস মজ্জার সঙ্গে না মিশে যায়।"

বীরবল—"এ জন্যই ত জীবনের যাত্রাপথে আপনাদের সাহচর্য অপরিহার্য। সংসারের ক্লেদ যখন গায়ে লাগবে আপনারা দু'হাতে তা থেকে পুরুষকে মুক্ত করবেন।"

কি কথায় কি কথা আসিয়া গেল। বীরবল ইহার পরে আরও

কি বলিয়া ফেলে এই ভাবিয়া সুবীথি মনে মনে শঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তার মনের গহন কোনের কোন গোপন দুর্বলতা পাছে স্পর্ধিত সাহসে বাড়িয়া উঠে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি কথার মোড় ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—"আমার দিদির সঙ্গে ত আপনার আলাপ হয় নি। দেখবেন, সংস্কৃত তথা ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে কি গভীর জ্ঞান। আর তেমনি নম্রস্বভাব ও চমৎকার কথাবার্তা।"

ততক্ষণে বীরবল নিজেকে সামলাইয়া নিয়াছে। সুবীথিই যে তাকে মনের এরূপ দুর্বলতা প্রকাশের লজ্জা থেকে রক্ষা করিয়াছে এজন্য সে মনে মনে তার উপর কৃতজ্ঞ হইল। ভাবের আবেগে কি বলিতে কি বলিয়া বসিত কে জানে! সুবীথিই বা তাকে কি ভাবিত!

মুখে জোর করিয়া হাসি টানিয়া বলিল—"আমার ত শুনে রীতিমত ভয় হচ্ছে। আমার অবস্থা হল 'তাবচ্চ শোভতে মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চিন্ন-ভাষতে'।

সুবীথি বলিল—"সংস্কৃত জানে শুনে দাদা ত বিষম ঘাব্‌ড়ে গেছেন। দাদা বলেন 'পরাধীনতার নাগপাশে যেমন আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে, সংস্কৃতের দুর্বোধ্য এবং অভেদ্য জটিলতায় তেমনি আমাদের ভাবকে ও অভাবকে খর্ব করে রেখেছে।"

বীরবল—"এ বিষয়ে আপনার দিদির কি মত?"

সুবীথি—"দিদি বলেন স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা এক জিনিষ নয়। বিন্দু বিন্দু জলীয় বাষ্প যদি অনন্ত আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে তবে যেমন তারা দানা বেঁধে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে না তাদের বিশেষ উত্তাপে বিশেষ বায়ুর চাপে একত্র থাকা দরকার, সংস্কৃতও তেমনি বিশেষ নিয়মের মধ্যে থেকে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে কল্যাণধারারূপে আমাদের উপর নেমে আসে।"

বীরবল—"আমাকে ত তবে বড় ভাবনায় ফেললেন। ময়লা ও ছেঁড়া জামা কাপড় নিয়ে কোন সম্ভ্রান্ত মজলিসে যেতে যেমন সংকোচ আসে, নিজের অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকায় আমারও তেমনি সংকোচ বোধ হচ্ছে।"

সুবীথি হাসিয়া বলিল—"আরে, আপনি কি রাজস্বয়ংবর সভায় চলেছেন যে রাজকন্যাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতে না পারলে বন্দী করে রাখবে। আপনার সেজন্য কোন উদ্বেগ নেই। এই যে দাদা হন্ হন্ করে কোথায় যাচ্ছে। ডাকুন ত?"

বীরবল—"বীরব্রতবাবু, বীরব্রতবাবু, ও বীরব্রতবাবু!"

বীরব্রত চমকিয়া দাঁড়াইল। তাকাইয়া দেখে বীরবল ডাকিতেছে সঙ্গে সুবীথি। তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিল—"যাক্, তোমাকে পেয়ে ভালই হল। ভাই, একখানা গালচে, আর খান চারেক কুশন দেওয়া চেয়ার তোমাকে যোগাড় করতে হবে। বিয়ে ব্যাপারটার সূচনাতেই যদি লোককে এরূপ অশান্তি ভুগতে হয়, তবে এর পরে না জানি কত অশান্তি থাকে। কেন যে লোকে যেচে এই অশান্তিকে বরণ করে? আমার আর সময় নেই।"

এই বলিয়াই সে দ্রুতবেগে রওনা হইল।

বীরবল দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল। তারপর সুবীথিকে বলিল—"আপনি তবে চাকরের সঙ্গে বাসায় যান। আমি জিনিষগুলি যোগাড়ের ব্যবস্থায় চললাম। এখন না গেলে আবার যার যার অফিসে বেড়িয়ে যাবে।"

সে বীরব্রতের অনুসরণ করিল। সুবীথি চাকরকে নিয়া বাসায় ফিরিল।

[কুড়ি]

গালিচা ও কুশন চেয়ার নিয়া বীরবল যখন সুবীথিদের বাসায় পৌঁছিল, তখন বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। কুলীদের মাথা থেকে চেয়ার ও গালিচা নামাইয়া রাখিয়া ভিতরে ঢুকিতেই বীরব্রতের মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি স্নেহের স্বরে বলিলেন—"এই যে তুমি এসেছ। আমি ত ভেবে ভেবেই সারা। এই দুপুর রোদ্দুরে না খেয়ে না দেয়ে—"

বীরবল তাড়াতাড়ি বলিল—"না মাসী মা, আমার কোনই কষ্ট হয় নি। এ রকম ঘোরাঘুরি করা আমার খুব অভ্যেস আছে। তা ছাড়া তখন না গেলে পাওয়াও যেত না।"

বীরবলের গলার আওয়াজ শুনিয়া সুবীথি ও বীরব্রত আসিল। বীরব্রত বলিল—"যাক্, ভাই, তুমি অবশেষে এসেছ। মা ত ভাবছিলেন যে গাড়ী চাপাই পড় না ছেলে ধরাই নিয়ে যায়। মা, তোমার বোনপো ত এসেছে। এবার আমরা খেতে পারি ত?"

মা একটু হাসিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

খাওয়া দাওয়া সারিয়া বীরব্রত ও সুবীথি বীরবলকে দেবহূতির কাছে নিয়া গেল পরিচয় করাইয়া দিতে।

অপরিচিত লোক দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেই বীরব্রত বলিল—"দেবী, ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, নাম বীরবল, জগন্নাথ কলেজে আই, এ পড়েন। কলেজ ইয়ুনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী এবং সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। খুবই কর্মী লোক এবং একজন অপরিজ্ঞাত সাহিত্যিক ও বটেন।"

তারপর বীরবলের দিকে তাকাইয়া বলিল—"ইনি আমার বোন দেবহুতি ওয়াকে দেবী, লরেটো থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন, সংস্কৃত এবং ইংরাজীতে খুবই দখল আছে। বর্তমানে আই, সি, এস মনোনয়নপ্রার্থিনী।"

বীরবল একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল—"মহিলা আই সি এসের কি মনোনয়ন হয়?"

বীরব্রত এবং সুবীথি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেবহুতির অধর প্রান্তে ও হাসির রেখা।

বীরব্রত হাসিতে হাসিতে বলিল—"আরে আই সি চাকুরীর মনোনয়ন প্রার্থিনী নন, এক আই সি এস্ চাকুরের মনোনয়ন প্রার্থিনী। তিনি যে আর একটু পরেই আসছেন।"

বীরবল লজ্জিত হইয়া চুপ করিল।

দেবহুতি বলিল—"আপনি বীরুদার কথা কিছু বিশ্বাস করবেন না। ও আমাকে অপ্রস্তত করার জন্য এরকমই বলে বেড়ায়।"

বীরবল প্রত্যুত্তরে বলিল—"আপনার সম্বন্ধে এখন যা শুনলাম, তার চেয়ে বেশী প্রায় সকলের কাছেই শুনেছি। কাজেই অতিরঞ্জনের স্বভাব থাকলেও সেটা আপনার সম্বন্ধে যে হয় নি তা নিশ্চয়। তবে আমার সম্বন্ধে যা শুনলেন সবটাই অতিশয়োক্তি।"

বীরবলের কথায় দেবহুতি একটু হাসিল মাত্র। এই স্বল্পভাষিণী মহিলার সেই হাসিতে সমস্ত প্রগলভতা, সমস্ত হাল্কাভাব যেন একমুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। বীরবলের মনে হইতে লাগিল সে যাহা বলিয়াছে, এই হাসির কাছে তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে।

দেবহুতি বলিল—"বসুন।" সকলে বসিল।

বীরবল দেখিল দেবহূতি অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু এই সৌন্দর্য মানুষকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়া তার লালসা প্রদীপ্ত করিয়া তোলে না, পূর্ণচন্দ্রের মত দূরে থাকিয়া স্নিগ্ধ শান্তির অবলেপে তার মনের সর্বাঙ্গ পূত ও প্রশান্ত করিয়া তোলে। এর সান্নিধ্য বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া তোলে না, সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রামকে আশ্চর্যরকমে সংযত ও বিশুদ্ধ করিয়া তোলে। এক মুহূর্তে বীরবলের সমস্ত মন ভক্তিতে, প্রীতিতে, শ্রদ্ধায় উদ্বেল হইয়া উঠিল।

দেবহূতি বলিল—"আপনার কথাও বীরুদার এবং বীথির মুখে অনেক শুনেছি। কাকিমা ত আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত।"

বীরবল একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"মাসীমার ঐ এক স্বভাব। কোন্‌দিন কি একটু করেছি, তাই তিনি পাড়ার এক এক জনকে অন্ততঃ দশ্‌বার করে বলেছেন।"

সুবীথি এতক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতেছিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা দিদি, তুমি কি অদৃষ্ট লিপি মান?"

দেবহূতি তার এই আকস্মিক প্রশ্নে একটু বিস্মিত হইল। বলিল—"হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?"

সুবীথি বলিল—"এমনি হঠাৎ মনে হল, তাই।"

দেবহূতি—"নিশ্চয়ই মানি। না মানলে যে সংসারের অনেক অসাম্যই অমীমাংশিত থেকে যায়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্রাদি যেমন এক অলঙ্ঘ্য নিয়মে অনাদিকাল থেকে এক পথেই চলছে, মানবজীবনও তেমনি সেই অনাদিকাল থেকে এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।"

সুবীথি—"কিন্তু অদৃষ্টের বিধান অমোঘ হলে মানুষের চেষ্টার কোন সার্থকতা আছে কি? সবাই ত যার যার হাত পা গুটিয়ে ঘরে

ধরে থাকতে পারে। দেশোদ্ধার, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন এ সবের চেষ্টাও ত নিরর্থক।"

বীরব্রত জানিত যে তাকে গ্রেপ্তার করার পর থেকেই সুবীথির মনে একটু দুর্বলতা, একটু সংশয় ঢুকিয়াছে। পুলিশ যে কোন মুহূর্তে তাদের গুপ্তসমিতির সমস্ত সভ্যকে জেলে পুরিতে পারে। তা হলে উপায়! এই যে আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস সুবীথির কিশোর মন আন্দোলিত করিতেছে, অদৃষ্টবাদের প্রশ্ন যে তাহারই বহিঃপ্রকাশ তাহা সে বুঝিল।

দেবহূতি—"মানুষের চেষ্টা শুধু তার নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য। যেমন মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার জন্য সিবিল সার্জন ডাকা। তাতে রোগী না বাঁচলেও শোকাতুর পিতামাতা এই বলে মনকে সান্ত্বনা দেয় যে আমাদের যথাসাধ্য ত করেছি।"

বীরব্রত—"তোমার যুক্তির একটা সুবিধে আছে যে দু'দিকেই কাটে। যদি সিবিল সার্জনের চিকিৎসায় নেহাৎই মুমূর্ষু রোগী বেঁচে ওঠে, তা হলে বলবে এই তার অদৃষ্ট। মানুষ যদি চেষ্টা করে সেটাও তার অদৃষ্ট, চেষ্টা না করলে সেটাও তার অদৃষ্ট।"

দেবহূতি—"কোন কঠিন সমস্যাকে অস্বীকার করলেই তার হাত থেকে এড়ানো যায় না। মাংসকে চোখবুজে বার্লি মনে করে খেলে তা বার্লির মত সহজ পথ্য হয়ে ওঠে না। আমরা যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে বহু চেষ্টায় বহু সাধনায় একটা জিনিষ গড়ে উঠেছে, অথচ হঠাৎ এমন একটা ওলটপালট হয়ে গেল যা আমরা কল্পনাও করতে পারি নি। তখন অদৃষ্টকে স্বীকার না করে কোন উপায় আছে কি?"

বীরব্রত—"ঠিক এই জন্যই আমরা এত দুর্বল, এত ভীরু। যত্ন করে হয়ত কেউ কেউ কোন জিনিষ গড়ে তুলতে পারি, কিন্তু ভেঙে

গেলে তার নৈরাশ্য সহ্য করতে পারি না। একবারের ব্যর্থতাটাকে অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বসে থাকি। রবার্ট ব্রুসের বীরত্ব হয়ত আমাদের মধ্যে দুর্লভ নয় কিন্তু তার অধ্যবসায় একেবারেই দুর্লভ।"

বীরবল এতক্ষণ নির্বাক থাকিয়া শুধু দেবহূতির কথা শুনিতেছিল। অদৃষ্ট পুরুষাকারের এই দ্বন্দ্ব চিরন্তনের। যাত্রাগানের আসর থেকে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিতদের বিতণ্ডা সভায়, চিন্তাশীল মনীষিদের গ্রন্থাদিতে এই দ্বন্দ্ব বহুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এর কোন কোন দিকের সঙ্গে তার সামান্য পরিচয়ও আছে। কিন্তু তাদের মতামতটা শুধু মতামতেই সীমাবদ্ধ। আর দেবহূতির মতের পশ্চাতে যে আস্ত দেবহূতি তার সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত আন্তরিকতা নিয়া বর্তমান। তাই তার কথাগুলি অত্যন্ত জীবন্ত হইয়া বীরবলের মন স্পর্শ করিল।

সে বীরব্রতকে বলিল—"যাই বলুন বীরব্রতবাবু, স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়ায় পৌরুষ হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু এগোনো যায় না। রাজপুতেরা সম্মুখযুদ্ধে বীরের মত প্রাণ বহুবার দিয়েছে কিন্তু যুদ্ধ জিতেছে কয়টা?"

বীরব্রত কি একটা বলিতে উপক্রম করিতেছে এমন সময় তার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—"তোমরাও দিব্যি আসর জমিয়ে বসেছ, ওদিকে বেলা যে তিনটে বাজে। পাঁচটার সময় না তাদের আসবার কথা? দেবী তুই শীগগীর উঠে আয়। পাড়ার মেয়েরা তোর জন্য অপেক্ষা করছে।"

দেবহূতির মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে বীরবলকে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি কাকিমার সঙ্গে চলিয়া গেল।

[একুশ]

দক্ষিণ ভারত প্রায় সমস্তটা ঘুরিয়া মিঃ মেয়ন মীরাকে নিয়া কাশী আসিয়াছেন। বরুণা ও অসির পূত স্রোতধারায় পবিত্রীকৃত হিন্দুর তীর্থরাজ এই কাশী। কত অগণিত নরনারী জাহ্নবীজলে অবগাহন করিয়া হৃদয়ের সমস্ত জ্বালা জুড়ায়, বিশ্বনাথের চরণতলে প্রণত হইয়া মনে এক অপূর্ব শান্তিলাভ করে। বিচার বিবেচনাহীন অহেতুকী ভক্তির এই স্বতঃউৎসারিত উচ্ছ্বাস মীরার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে।

প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে সে একাকী দশাশ্বমেধ ঘাটে চলিয়া আসে। সেখানে কোথায়ও বা সন্ন্যাসীদের হর হর ব্যোম ব্যোম ধ্বনি, কোথায়ও বা স্নানার্থী স্নানার্থিনীদের 'জয় মা গঙ্গা,' 'গঙ্গা মায়িকী জয়' শব্দ, কোথায়ও বা উচ্চ-নিনাদিত সামগান, কোথায়ও বা ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত সুমধুর অথচ গম্ভীর স্তোত্র পাঠ। সমস্ত মন এক অপূর্ব পুলক রসে আপ্লুত হয়, এক পবিত্র অথচ মধুর, ভক্তিরসোচ্ছ্বলিত অথচ উদাত্ত এবং গম্ভীরভাবে মনের আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হয়।

মীরা আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

পাশ্চাত্যশিক্ষাপুষ্ট এই নারী কোনদিন ধর্ম সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই, ধর্মাচরণকে ভণ্ডামি বলিয়াই জানিয়াছে। গঙ্গাস্নান, তীর্থস্থানে যাওয়া, দেবতার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা—অবজ্ঞাপূর্ণ বিদ্রূপের হাসিতে এই সব সংস্কারকে কুসংস্কার বলিয়া মনে মনে কতবার ব্যঙ্গ করিয়াছে। শিক্ষার অভাবই

যে ইহা মূলীভূত কারণ ইহা ভাবিয়া দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর বেদনায় তার হৃদয় করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আজ নিবিড় দুঃখ, গভীর ব্যথা তার শিক্ষার সমস্ত গর্বকে চূর্ণ করিয়া তাকে সাধারণের সমপর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে।

পত্নী যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তার জীবনলাভের আশায় ঘোরতর শিক্ষাভিমানী, পৌত্তলিকতায় সুদৃঢ়রূপে অবিশ্বাসী স্বামীও যেমন মায়ের প্রসাদী রক্তজবা বা নারায়ণের চরণামৃত পূর্ণ বিশ্বাসে এবং কাচে তাকে দিতে দ্বিধা করেনা, মীরারও আজ তেমনি মনে হইতে লাগিল সে ছুটিয়া গিয়া গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া আসে, বিশ্বনাথের চরণে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করে।

মীরার মনে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। ভগবানের উপাসনায় এই বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলির সত্যিকার প্রয়োজন আছে কিনা এই নিয়া গঙ্গার ঘাটে দু'একজন সাধুর সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া সে দেখিয়াছে, অধিকাংশেরই গৈরিক বসন একটা উপজীবিকা, তারা এসব বিষয় বলে তারা প্রয়োজন মনে করে না। আর দু'একজন যারা এ বিষয়ে ভাবেন তারা এ জাতীয় প্রশ্নকে এড়াইয়া যান।

সে ভাবিল তার বাবার সঙ্গে এই নিয়া আলোচনা করিবে। উপলব্ধি না থাকিলেও এসব বিষয়ে মিঃ মেয়নের সুগভীর জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় সে পাইয়াছে।

সেদিন গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরিয়া মীরা দেখে তার বাবা সবে মাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছেন। সে বলিল—"বাবা! তুমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে এস, চা খেতে খেতে তোমার সঙ্গে একটা বিষয় আলোচনা করব।"

মিঃ মেয়ন একটু চিন্তিত মনে বাহিরে গেলেন। আবার কোন্

নূতন সমস্যা তার কন্যার জীবনে দেখা দিল? ভগবান কি এ একদিনের জন্যও শান্তি দেবেন না? একটা ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাস সমস্ত অন্তর আলোড়িত করিল।

মিঃ মেয়ন চায়ের টেবিলে বসিলে মীরা স্বহস্তে তার পেয়ালা চা ঢালিয়া দিয়া নিজের পেয়ালা পূর্ণ করিয়া নিল। চাকর আসি মিঃ মেয়নকে দিল অর্ধসিদ্ধ ডিম, টোষ্ট ও মাখম, আর মীরাকে দি কয়েক টুকরা পেপে ও আনারস এবং দুটা কলা। মীরা আজ ক দিন ধরিয়া নিরামিষ খাইতেছে।

মিঃ মেয়ন সবে মাত্র চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়াছেন সময় মীরা জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা বাবা! ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান কোন সার্থকতা আছে কি?"

মিঃ মেয়ন বুঝিলেন মীরা ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের ডুবিয়া থাকিয়া মনের সমস্ত ব্যথা, সমস্ত জ্বালা ভুলিতে তাই এই প্রশ্ন। তিনি বলিলেন—"আছে বৈ কি মা? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা মনের দুর্বলতার একটা বহিঃ প্রকাশ।"

মীরার চিত্ত আরও সংশয়াকুল হইয়া উঠিল। সে বলি "কেন?"

মিঃ মেয়ন বলিলেন—"দুর্বল মনের স্বাভাবিক অবস্থা হইল অনাসক্তি। তাই মনকে ব্যাপৃত রাখার জন্য যেখানে জন দুঃখীর দুঃখমোচন, আর্ত ও পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতি অসংখ উপায় বর্তমান, সেখানে নৈষ্ক্রিয় বাহ্যিক অনুষ্ঠানের উপরই ঝোঁক বেশী।"

মীরা—"কিন্তু বাহ্যিক অনুষ্ঠানের ভিতরও ত ভগবানকে করবার সুযোগ থাকে?"

...ন—"তাতে হয়ত ভগবানকে দু'একবার ডাকা যায়, যে ই... ...ক আন্তরিকতাহীন অথবা স্বার্থগন্ধময় আহ্বানে কি তার উপর... ...? কর্মের দ্বারা আমাদের উপস্থিতির খবর যদি তাঁর ...পৌঁছে, সেটা কি দু'একটা মৌখিক ডাকের চেয়ে কার্যকরী ... না?"

মীরার অন্তর তার পিতার কথায় সায় দিল না। তার পিতা ত গ...ার ঘাটের অগণিত নরনারীদের স্নান দেখেন নাই? তার পিতা ত... বিশ্বনাথের আরতির সময়ে শঙ্খঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে পাণ্ডাদের উদাত্ত ক...ণ্ঠের বেদধ্বনি মিশ্রিত হইয়া প্রাণে যে এক অভূতপূর্ব ভাবরসের ...করে তার আস্বাদন পান নাই?

কিন্তু বিশ্বনাথ মীরাকে শান্তি দিতে পারিলেন না। কি একটা ...ভূত অভাববোধ তার সমস্ত চিত্তকে মথিত করিতে লাগিল, ...র সর্বকার্যে এবং রাত্রির নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল। ...কদিনের মধ্যেই কাশীতে তার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল।

শেষে সে একদিন তার পিতাকে বলিল—"বাবা! কা...র এসব...ল লাগে না, চল অন্য কোথায়ও যাই।"

মিঃ মেয়ন কন্যাকে নিয়া আগ্রায় আসিলেন। মোগল সম্রাটগণের ...স্মৃতিবিজড়িত এই আগ্রানগরী। পুরাণো দুর্গের ভিতর প্রবে... উপল...রিলে মোগল সাম্রাজ্যের সমগ্র ইতিহাস যেন জীবন্ত হইয়া পর প... ...চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী খাস, মতি ...সজিদ, ময়ূর সিংহাসন—মন এক স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া যায়।

সর্বোপরি তাজ। দুর্গের ছাদের উপর যে কৃষ্ণমর্মর গঠিত আসনে ...বসিয়া শাজাহান যমুনার পরপারে তাজমহলের দিকে চাহিয়া কত ...বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেন, সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে সেই তাজ

তাদের নিকট এক অপূর্ব রহস্যময়ী পুরী বলিয়া মনে হইল। দীর্ঘদিনের বিয়োগ ব্যথা মিঃ সেনের মনে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল, মীরার হৃদয় নূতন করিয়া শোকাতুর হইয়া উঠিল।

পিতাপুত্রী তাজমহল দেখিতে গেলেন। সম্মুখে গেলে তার অপূর্ব কারুকার্য ও স্থাপত্য, অনন্যকরণীয় বর্ণদ্যুতি বহিরিন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া ফেলে, পশ্চাতের ব্যথাভরা কাহিনী নিষ্প্রভ হইয়া আসে, মন স্বপ্নরাজ্য থেকে বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসে।

উভয়ে মুগ্ধনয়নে চাহিয়া রহিলেন।

মীরা বলিল—"আচ্ছা বাবা! আমার মনে হয় তাজের পেছনে এরকম একটা ব্যথাভরা স্মৃতি আছে বলেই তাজ এরূপভাবে আমাদের মর্মস্পর্শ করে। তাজকে আমরা যখন দেখি তখন সে দৃষ্টিতে শাজাহানের বিরহ কাতর দৃষ্টি মিশ্রিত থাকে না কি?"

মিঃ সেন বলিলেন—"শাজাহানের আখ্যায়িকা জড়িয়ে তাজের যে রূপ আমরা মনের মধ্যে সৃষ্টি করি, তাহা তার বাইরের রূপ নয় সেটা আমাদের মানসী সৃষ্টি। আমার ত মনে হয় তাজমহল তৈরি করার সময় মমতাজের স্মৃতির চেয়ে শাজাহানের নিজের স্মৃতির দিকেই বেশী নজর ছিল।"

মীরা বলিল—"সে কি বাবা! তুমি কি বলতে চাও একনিষ্ঠ প্রেমকে অমরতা দেওয়াই এই তাজমহল সৃষ্টির গোড়ার কথা নয়?"

মিঃ সেন একটু হাসিয়া বলিলেন—"একনিষ্ঠ প্রেম কি করে বল, যখন ইতিহাস বলে শাজাহানের পত্নীর সংখ্যা শতাধিক ছিল।"

আগ্রা থেকে উভয়ে দিল্লী গেলেন। দিল্লীতে গিয়া মনে হইল যে এটা যেন আগ্রার একটা পরিবর্তিত রাজকীয় সংস্করণ। ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর, কুতুব মিনার কোনটাই প্রাণে সাড়া দিল না।

মীরার পীড়াপীড়িতে দীর্ঘ ছয় মাস পরে উভয়ে মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন।

[বাইশ]

মিহির মনে মনে সাব্যস্ত করিয়া আসিয়াছিল যে মেয়ে সে পছন্দ করিবেই বিনা প্রশ্নে, বিনা জিজ্ঞাসায়, কোনরূপ যাচাই না করিয়া। মীরাকেই যদি না পাওয়া গেল তবে আর বাছাবাছির দরকার কি? দৃষ্টিশক্তিই যদি হারাইতে হয়, তবে চশমা পরিয়া চক্ষুর বাহ্যিক সৌন্দর্য বজায় রাখার সার্থকতা আছে কি? মীরার বিষাদ-কাতর মুখ, র ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস, তার সজল চাউনি, তার সমস্ত মুহূর্তগুলি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

হেরম্ববাবু দেবহূতিকে নিয়া আসিলেন, কিন্তু মিহির ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিল না।

বীরবল হেরম্ববাবুর সঙ্গে কালীকিঙ্করবাবু ও মিহিরের পরিচয় করাইয়া দিল। প্রথম আলাপ পর্ব শেষ হইলে তাহারা উপবেশন করিলেন।

দেবহূতি পিতা ও ভাবী শ্বশুরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া একপাশে বসিল।

দু' এক মিনিট নীরবে অতিবাহিত হইল, কিন্তু সবাই নিশ্চুপ। মিহির নিজেকে একটু বিব্রত বোধ করিল। কি সে জিজ্ঞাসা করিবে তার ভাবী বধূকে? প্রথমতঃ মীরার স্মৃতি সহসা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া তার কোন প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালার সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকায় কোনটা শোভন এবং কোনটা অশোভন হইবে তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকা ভাল দেখায় না। এই মনোনয়ন পর্ব কোনরূপে শেষ করিতে পারিলেই মিহির বাঁচে। তাই সে অবশেষে দেবহূতির দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল—"আপনি লরেটো থেকে কোন ইয়ারে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন ?"

দেবহূতি মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল—"গত বৎসর।"

মিহির—"আমার মাকে আপনি দেখেছেন ?"

দেবহূতি—"হ্যাঁ।"

মিহির—"কেমন লাগল ?"

দেবহূতি—"চমৎকার।"

মিহির আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। পিতাকে বলিল—"তা হলে এবার আমরা উঠি ?"

হেরম্ববাবু বলিলেন—"সেকি, একটু জলটল না খেয়ে যেতে পারবেন না। যাও ত দেবু, দেখ ত কদ্দুর।"

কালীকিঙ্করবাবু মোলায়েমভাবে হাসিয়া বলিলেন—"আমাদের আবার ৬টার লঞ্চে ফিরতে হবে কি না, তাই আর অপেক্ষা করলে লঞ্চ পাওয়া যাবে না।"

হেরম্ববাবু বলিলেন—"না, না, বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কেন ? এখন মোটে সাড়ে পাঁচটা ? আচ্ছা আমিই দেখছি। একটু কিছু না খেয়ে কিন্তু যেতে পারবেন না ?"

হেরম্ববাবু ব্যস্তসমস্তভাবে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

পিয়ানো ঘরের কোণে নীরবে পড়িয়া রহিল, হারমনিয়ম বাক্সের

মধ্যে যৌবনম্লান পাড়ার মেয়েরা বৃথাই এদিক সেদিক কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

দেবহূতি দ্বিতীয় দফায় নমস্কারের পালা শেষ করিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেল।

জলযোগ পর্ব শেষ করিয়া পিতাপুত্রে যখন বাহিরে আসিলেন, তখন ৬টা বাজিবার ৭ মিনিট মাত্র বাকী। হেরম্ববাবুও সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিলেন।

কালীকিঙ্করবাবু—"আচ্ছা, এখন তবে আসি, নমস্কার।"

হেরম্ববাবু—"নমস্কার।"

কালীকিঙ্করবাবু—"আমি বাড়ী পৌঁছেই আপনাকে মতামত জানাব।"

একটা ধাবমান ট্যাক্সিকে থামাইয়া উভয়ে তাতে উঠিয়া পড়িলেন। কালীকিঙ্করবাবু বলিলেন—"সদরঘাট, জলদি।"

ট্যাক্সি বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল।

এদিকে মেয়ে দেখা নিয়া পাড়ার সমবেত মেয়েদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। একজন বলিলেন—"এ আবার কেমন ধারা মেয়ে দেখতে আসা? দু'দণ্ড বোস, দু'চারটা কথা জিজ্ঞেস কর, না এ যেন একেবারে কাঠখোট্টা সেপাই। আসল, দু'মিনিট বসল, তারপর গটগট করে চলে গেল।"

দ্বিতীয়া বলিলেন—"ম্যাজিষ্ট্রেটের হাল চাল ত আমরাও একটু আধটু জানি। আমার বড় ভায়ের মেয়ে মনিকে ত দেখেছ। তার বর হল ম্যাজিষ্ট্রেটের পেস্কার, তার পাসেই বসে, সে ত মেয়ে দেখতে এসে মেয়ের আঙ্গুল পর্যন্ত নিজে টিপে দেখেছিল। আর এ ত নামটা পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করল না।"

তৃতীয়া বলিলেন—"আরে ভাই, মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে পর্যন্ত দেখ্‌ল না। আমার উনি ত বলেন বিয়ে হ্‌বার আগে আমাকে একবার দেখ্‌বার জন্ত কত ফন্দী ফিকির করেছেন। সেত ২০।২৫ বছর আগের কথা। এ কেমন ধারা ব্যাপার বোঝা গেল না।"

চতুর্থী—"আর বাপটাই বা কি রকম? তুই সঙ্গে আছিস তাই ছেলে হয়ত লজ্জায় বেশী কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না। তুই না হয় একটা গান করতে বল্‌, পিয়ানো বাজ্‌নাটা একটু শোন্‌, সেলাই টেলাই কি জানে জিজ্ঞেস কর্‌। তা না, তুইও নূতন জামাইটির মত চুপ করে বসে রইলি। যা বল ভাই, এ সম্বন্ধ হবে বলে ত আমার মনে হচ্ছে না।"

হেরম্ব বাবু মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মা, বর পছন্দ হল?"

বেবহুতির মুখ আরক্তিম হইল, কিন্তু সে কোন কথা বলিল না।

[তেইশ]

মিহির নিজের মানসিক চাঞ্চল্য কিছুতেই গোপন করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু কি করিবে সে? মা বা মীরা একজনকে ত তার ছাড়িতেই হইবে।

মনের এই বেসামাল অবস্থা নিয়া মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইতে তার ভয় করিতে লাগিল। বুদ্ধিমতী তিনি, সহজেই বুঝিতে পারিবেন এ বিবাহে ছেলের মত নাই। কিন্তু কোন বিবাহেই যে মত নাই এ কথা ত সুমিত্রা দেবী জানেন না। এ কথা ত মিহির তাকে বলিতে

পারিবে না। বলিতে পারিলেও তাতে মার মনেই শুধু আঘাত দেওয়া হইবে, মীরার সঙ্গে বিবাহে তিনি কিছুতেই সম্মত হইবেন না।

মিহির মনে করিল—"না, এ সন্দেহাকুল অবস্থায় আর থাকব না। এক্ষুনি বাবাকে দিয়ে ওদের লিখিয়ে দিই, যে বিয়েতে আমাদের সম্মতি আছে, আমরা পাকাপাকি ভাবে আপনাকে জানালাম। দিন স্থির করে আমাদের জানান। একবার কথা দিয়ে ফেললে শেষে ত আর মা ওল্টাতে পারবেন না।"

বাবাকে বলিল—"আপনি এক্ষুনি ওদের লিখে দিন যে বিয়েতে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে, ওঁরা যেন সত্বর দিন স্থির করে জানান। আমার আর ৩ সপ্তাহ ছুটি আছে, সম্ভব হলে এর মধ্যেই হতে পারে এও জানাবেন।"

কালীকিঙ্কর বাবু বলিলেন—"বাড়ী গিয়ে তোমার মার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে তারপর চিঠি দিলে হয় না?"

মিহির—"তার আর দরকার কি, বিশেষ মা ত বহুপূর্বেই মত দিয়েছেন। আমার ছুটির মধ্যে দিন স্থির করলে ওদের ত সব যোগারযন্ত্র করতে হবে, কাজেই এখনি লিখে দিলে ওদের সুবিধা হবে।"

কালীকিঙ্কর বাবু—"কিন্তু সঙ্গে ত পোষ্টকার্ড, এন্‌ভেলাপ নেই।"

মিহির—"আমার কাছে আছে, আমি দিচ্ছি।"

মিহির কালীকিঙ্কর বাবুকে এটাচিকেস খুলিয়া লিখিবার সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া দিল, মায় টিকিট পর্যন্ত। কালীকিঙ্কর বাবু তখনই চিঠি লিখিয়া দিলেন।

মিহির এবার নিশ্চিন্ত হইল। মুখ তার যতই বিমর্ষ দেখাক, হৃদয় যতই গভীর বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠুক, নিজের মৃত্যুদণ্ডের হুকুম নিজে লিখাইয়া অনিশ্চিত মৃত্যুযাতনার হাত থেকে ত সে

পরিত্রাণ পাইল। কর্তব্যের কাছে হৃদয়কে বলি দিয়া এবং আর একটি জীবনকে বলি দিয়া ধর্মের কাছে অপরাধী হইল কি না বলা শক্ত, তবে সমাজের কাছে ত ঋণমুক্ত হইল।

গন্তব্যস্থলে পৌছিলে লঞ্চ থেকে নামিয়া চিঠি সে নিজে তাকে দিল, তারপর ধীরে ধীরে পিতার অনুসরণ করিল।

সে রাত্রে মিহির কিছু খাইল না। শরীর ভাল নাই বলিয়া আসিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। সুমিত্রা দেবীর অনেক ডাকাডাকিতেও দরজা খুলিল না। নিজের মনকে এত দুর্বল ও অসহায় মনে হইল যে মায়ের জেরায় পড়িয়া মেয়ে সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার মত মানসিক অবস্থা তার ছিল না।

ভোরে সুমিত্রা দেবী উঠিয়া দেখেন মিহির বাহির হইয়া গিয়াছে। এত সকালে কোথায় গেল? তবে কি সে মায়ের উপর অভিমান করিয়া এই বিবাহে সম্মতি দিয়া আসিল?

মিহির যখন বেড়াইয়া ফিরিল, তখন ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। আসিতেই সুমিত্রা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত ভোরে উঠে কোথায় গেছ্‌লে?"

মিহির—"একটু বেড়িয়ে এলাম।"

সুমিত্রা দেবী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মিহিরের দিকে তাকাইলেন—দেখিলেন, সে মুখে বিষাদের গাঢ় কালিমার অস্পষ্ট ছাপ। তিনি সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"খোকা, মেয়ে কি তোমার পছন্দ হয়েছে?"

মিহির—"হ্যাঁ, মা, খুবই পছন্দ হয়েছে। তাই ত তাড়াতাড়ি বাবাকে দিয়ে রাস্তা থেকেই পাকাপাকি ভাবে চিঠি লিখিয়ে দিলাম।"

সুমিত্রা দেবী—"দেখ, আমার চোখকে ফাঁকী দিতে চেষ্টা কর না। তোমার মুখ চোখ বলছে এ বিয়েতে তোমার মত নেই। তবে কেন

তুমি আপত্তি করলে না? কেন আমাকে না বলেই তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিয়ে দিলে?"

মিহির বহু কষ্টে মুখে হাসি আনিয়া বলিল—"সত্যি বলছি মা, এ মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। এবার যত শীগ্‌গীর সম্ভব শুভকাজটা সেরে ফেল।"

মিহিরের কথায় সুমিত্রা দেবী সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তবে যা গুজব শুনা গিয়াছে তাই সত্য? তবে কি মাদ্রাজী মীরাই তার ছেলেকে ভুলাইয়াছে?

এ নিয়া সুমিত্রা দেবী আর আলোচনা করিতে সাহস পাইলেন না। যদি কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়? তিনি মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে বিয়েটা ত হয়ে যাক। দেবহূতির মত মেয়েকে কাছে পেলে খোকা মীরাকে ভুলবেই।

চারদিন পরেই হেরম্ব বাবুর চিঠি পাওয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর রায় মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার নিকট থেকে বিবাহের সম্মতিসূচক পত্র পাইয়া সবিশেষ কৃতার্থ হইলাম। আমার এই একমাত্র মেয়ে এবং জীবনে এই প্রথম ও শেষ কাজ। তাই আপনার নিকট একটু সময় ভিক্ষা চাই। এখন শ্রাবণ মাস চলছে। আপনাদের সম্মতি থাকিলে আমি অগ্রহায়ণের ১৫ তারিখে বিবাহের দিন ধার্য করিতে চাই। পত্রপাঠ আপনার মতামত লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রীহেরম্ব চন্দ্র মিত্র।

কালীকিঙ্করবাবু চিঠি পাইয়াই সুমিত্রা দেবীকে দেখাইলেন। সুমিত্রা দেবী চিঠি পড়িয়া মিহিরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মিহির আসিলে বলিলেন—"এই দেখ খোকা, দেবস্মৃতির বাবা কি লিখেছেন।"

চিঠি পড়িয়া মিহির বলিল—"বেশ ত তারা যখন একটু ঘটা করেই মেয়ের বিয়ে দিতে চায় তখন অঘ্রাণেই হোক। তবে এ মাসে হয়ে গেলে আমার আর ছুটি নিতে হোত না। তাই তাদের জানাও, ১৫ই অঘ্রাণেই তোমরা রাজী।"

মিহির চলিয়া গেল।

[চব্বিশ]

আজ মিহির চলিয়া যাইবে। দু'দিন যাবৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সব সময় টিপি টিপি করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বিশেষ করিয়া গতকল্য থেকে ঝড়ের মত বাতাস গিয়াছে। আজও আকাশের অবস্থা পূর্ববৎ।

ভোরে উঠিয়াই সুমিত্রা দেবী বলিলেন—"খোকা, আজ তোমার যাওয়া হতে পারে না। আকাশের যা অবস্থা তাতে একটা বড় রকমের ঝড় হওয়াও বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ নদীপথে যাবে।"

মিহির বলিল—"না মা, এ রকম বৃষ্টি বাতাস ত দু'দিন থেকেই চলছে, এতে কোন ভয় নেই। ৪।৫ দিনের মধ্যেও ত না থামতে পারে। অঘ্রাণ মাসে আবার যখন ছুটি নিতেই হবে, তখন আর মিছামিছি দেরী করব না।"

সুমিত্রা দেবী—"আমার যে মন আশ্বস্ত হচ্ছে না। নদীর মধ্যে ষ্টীমার থাকতে যদি ঝড় ওঠে।"

মিহির হাসিয়া বলিল—"মরবার হলে ত ঘরে বসেই হার্টফেল্ করে মরতে পারি। তার জন্য ঝড় সাইক্লোনের প্রয়োজন কি?"

সন্তান সম্বন্ধে মায়ের দুর্বলতা স্বাভাবিক। তাই যে সুমিত্রা দেবী অতি বড় বিপদেও ভগবানের উপর অটুট নির্ভরে দৃঢ় থাকিতে অভ্যস্ত, তাঁর ও সন্তানের বেলা সে দৃঢ়তা শিথিল হইয়া আসিল। পরম স্নেহে মিহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"না খোকা, আর একদিন না হয় মায়ের কাছে থেকেই গেলে। হ্যাঁরে, মার' কাছে থাকতে এখন বুঝি আর ভাল লাগে না!"

মায়ের এই স্নেহের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস মিহিরকে টলাইতে পারিল না। আজ সে যাবেই। নিজের যা মানসিক অবস্থা, তাতে আর একদণ্ডও তার বাড়ীতে থাকা অসহনীয়। বলিল—"না মা, যাওয়া আমার আজই দরকার, না হলে কাজের ক্ষতি হবে। আমি যাই জিনিষপত্রর গুছাইগে।"

মিহির চলিয়া গেল। অলক্ষিতে সুমিত্রা দেবীর হৃদয় হইতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এইত সন্তান! এর জন্য এত মমতা, এত আকর্ষণ! হায় রে মায়ের প্রাণ!

মিহির যখন ষ্টীমার ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল, তখন আকাশের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। বাতাস নিস্তব্ধ, সমস্ত প্রকৃতিতে একটা নীরব, থমথমে ভাব। আকাশের রঙে নদীর জল কালো হইয়া উঠিয়াছে, তরঙ্গগুলি যেন কি একটা গভীর আশঙ্কায় নিথর, নিস্পন্দ। প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপের সঙ্গে মিহিরের পরিচয় ছিল না। তাই কি এক অজ্ঞাত ভয়ে অথচ তীব্র আকর্ষণে তার বুক দুরুদুরু করিয়া

উঠিল। একবার ইচ্ছা হইল যে বাড়ীতে ফিরিয়া যায়। কিন্তু পৌরুষে বাধা দিল, মিহির ষ্টীমারে উঠিল।

এই ভীষণ দুর্যোগে নদীপথে যাওয়া নিরাপদ নয় বলিয়া ষ্টীমারে যাত্রীর সংখ্যা খুব কম ছিল। যারা ছিল তারাও দু'এক ষ্টেশন পরে নামিয়া গেল। রহিল শুধু মিহির আর দুটি যুবক,—বোধ হয় মার অসুখের সংবাদ অথবা কোন পারিবারিক দুর্ঘটনার তার পাইয়া দেশে যাইতেছে।

ফার্ষ্টক্লাশ ডেকে একখানা ইজিচেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া মিহির গভীর চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গেল। কখন যে কি এক মন্ত্রবলে জলস্থল সব লেপিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, কখন থেকে যে বৃষ্টির ছাট আসিয়া তার জামাকাপড় সব ভিজাইয়া চুপ্‌চুপে করিয়া দিয়াছে, কিছুই তার খেয়াল নাই। মীরার দুর্ভাগ্যের কথা, বর্তমানকে সম্পূর্ণরূপে ভুলাইয়া দিয়া, অতীতের মধ্যে তাকে গভীরভাবে নিমজ্জিত করিল।

চমক ভাঙ্গিতেই দেখে জলস্থল আকাশের কি অদ্ভুত সমন্বয়, কি অপূর্ব সংমিশ্রণ। নিবিড় কুজ্ঝটিকায় দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন—শুধু বৃষ্টির অবিরাম পতন-শব্দ, শুধু প্রমত্ত বায়ুর গভীর আস্ফালন। মাঝে মাঝে ষ্টীমারের সুতীব্র বংশীধ্বনি করুণ আর্তনাদে আকাশের বুক চিরিয়া দূর দিগন্তে মিলাইয়া যাইতেছে—অত্যাচারীর নির্মম অত্যাচারে উৎপীড়িতের মর্মভেদী অসহায় আর্তনাদের মত।

মিহির নীরব, নিস্তব্ধ। বাহিরে প্রকৃতির উন্মত্ত নর্তন, ভিতরে তার হৃদয়ে হয়ত তার চেয়েও ভয়ানক ঝড়, প্রবল আলোড়ন। মাদ্রাজে গিয়া সে মীরাকে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? এই সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া যে নারী তিলে তিলে পলে পলে তার জন্ত নিজেকে উৎসর্গ

করিয়াছে, তার সমস্ত কামনা, সমস্ত বাসনা, সকল আকাঙ্ক্ষা শুধু তার উপযোগী করিয়া নিজেকে তৈয়ারী করা, তার মনে এরূপ নির্মম আঘাত দেওয়ার পর সে কি জীবনে সুখী হইতে পারিবে? ভগবান কি তাকে ক্ষমা করিবেন? সে নিজে কি নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিবে?

প্রকৃতির এই প্রলয়োন্মত্ততা তার নিকট বিধাতার রুদ্ররোষের বহিঃপ্রকাশ বলিয়াই মনে হইল। তাই সে সাদরে তাকে আহ্বান করিল, মনে মনে তাকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সমস্ত জীবন তুষের আগুনে দগ্ধীভূত হওয়ার চেয়ে একদিনেই তার শেষ হইয়া যাওয়া তার নিকট পরম কাম্য বলিয়া মনে হইল।

বাহিরের অবস্থা এদিকে ক্রমশঃই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে। মিহিরের সমস্ত জামাকাপড় সিক্ত—তীক্ষ্ণ, শীতল, সজল হাওয়ায় তার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিতেছে। এক জায়গায় দাঁড়াইবার বা বসিবার উপায় নাই। সারেঙের আদেশে খালাসীরা আসিয়া সমস্ত পর্দা তুলিয়া দিয়াছে, জাহাজের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অবারিত জলস্রোত।

টলিতে টলিতে মিহির কেবিনের একটা খোলা জানালা ধরিয়া কোন রকমে দাঁড়াইল, বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখে, তার পুরাতন পরিচিত পৃথিবী আর নাই। ধরিত্রীর সুমধুর রূপ কোথায় নিশ্চিহ্ন-রূপে মুছিয়া গিয়াছে। একটা স্ফুলিঙ্গের ভিতর যেমন অনন্ত দাহিকাশক্তি লুক্কায়িত থাকে, তেমনি এই প্রলয়ঙ্করী শক্তি এই অসীম জলরাশির মধ্যে কোথায় লুক্কায়িত ছিল?

সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে মিহিরের পরিচয় ছিল। বিলাতের পথে বড় বড় সমুদ্র তাকে পাড়ি দিতে হইয়াছে, কিন্তু সেখানে জলের সঙ্গে

জাহাজের সম্পর্ক ছিল স্নেহের, প্রেমের। স্নেহপ্রাণ পিতা যেমন ক্রীড়াচ্ছলে সন্তানকে একবার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আবার পরম আদরে বুকে টানিয়া নেন, সেখানে সমুদ্রও জাহাজের সঙ্গে পরম স্নেহে খেলা করে।

কিন্তু এ কী! লুব্ধ হিংস্র বারিরাশি উদ্ধত বিদ্রোহে গগন স্পর্শ করিতে উদ্যত, সমগ্র জাহাজখানা তার তীব্র পীড়নে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, ফেনিল উন্মত্ত দস্যুতায় ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিয়া দুরন্ত আক্রোশে তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। মিহির ক্ষণকালের জন্য সংহাররূপিণী প্রকৃতির এই ধ্বংসোদ্যত লীলা পরম বিস্ময়ভরে দেখিল।

হঠাৎ বাতাসের একটা প্রবল ঝাপ্টা আসিয়া তাকে ঠেলিয়া ডেকের উপর ফেলিয়া দিল।

মিহির এবার বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল। দেখিল—যুবক দুটি 'লাইফ-বয়' নিয়া প্রস্তুত। কিন্তু বাহিরের দিকে চাহিয়া মিহির বুঝিতে পারিল তাদের এই চেষ্টা কতখানি হাস্যকর। হঠাৎ যেন মনে হইল জাহাজ আর চলিতেছে না। তবে কি এবার অন্তিম সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে, তবে কি আস্তে আস্তে সে ডুবিয়া যাইতেছে? মৃত্যুকে এত কাছাকাছি এবং এমন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পাইয়া মিহিরের সমস্ত দেহমন কী এক অননুভূত হিমপ্রবাহে জমাট বাঁধিয়া গেল। এতক্ষণ মনে মনে মৃত্যুকে ডাকিলেও মনের অবচেতন কোণে একটি গোপন আশা লুকায়িত ছিল যে ষ্টীমার ডুবিতে পারে না। কিন্তু এখন জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তার অন্তর থেকে সমস্ত ব্যথা, সমস্ত অভিমান, সব জ্বালা কী এক স্নিগ্ধ প্রলেপে যেন জুড়াইয়া গেল। মায়ের প্রতি, মীরার প্রতি, এমন কি

দেবদূতির প্রতি পর্যন্ত তার হৃদয় স্নেহে, প্রীতিতে, মমতায় সিক্ত হইয়া উঠিল।

একজন খালাসী আসিয়া বলিয়া গেল—"এবার খোদাকে ডাকুন, জাহাজ বুঝি আর বাঁচে না।"

মিহির ক্লিষ্ট, অবসন্ন ও শ্রান্ত দেহমনে কোনরকমে সারেঙের কাছে গেল। সারেঙ জানিত যে মিহির প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। তাই একটু সসম্ভ্রমে বলিল—"সাব্, ষ্টীমার বুঝি আর রক্ষা করতে পারা গেল না। ঢেউয়ের প্রবল ধাক্কায় দুটি চাকাই ভেঙ্গে গেছে, এখন একমাত্র খোদা ভরসা।"

বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া সারেঙের স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। যুবক দু'টিও আস্তে আস্তে সেখানে আসিয়া জুটিল। হঠাৎ একটা প্রবল দমকা বাতাসে জাহাজ একটু কাত হইল। সারেঙ উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—"কেবিনের দরজাগুলি শীগ্‌গীর ভেঙ্গে ফেল, কুড়ুল, দা, হাতুড়ী, যা পাও তাই দিয়ে—শীগ্‌গীর।"

জীবন মরণের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া খালাসীদের দেহে যেন মত্ত হস্তীর বল আসিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর সমস্ত কেবিন ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

এবার আর কোন আড়াল, কোন আশ্রয় থাকিল না। মিহির মনে মনে বুঝিল জাহাজ যদি একান্তই না ডোবে, এই সিক্ত হাওয়ায়, এই অবিরাম বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় আর বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। তার সমস্ত শরীর যেন ধীরে ধীরে অসার হইয়া আসিতেছে, মৃত্যুর একটা তুহিন-শীতল স্পর্শ যেন ধীরে ধীরে তাকে অবশ, সংজ্ঞাহীন করিয়া আসিতেছে।

বাতাসের প্রমত্ততা আরও বর্দ্ধিত হইল। খালাসীরা নীচ থেকে

বিষণ্ণমুখে মৃত্যুভীত দৃষ্টিতে আস্তে আস্তে উপরে আসিয়া একত্রিত হইল। সারেঙ চমকিত হইয়া তাকাইতেই একজন ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"নীচের তলা দিয়ে অবিরাম জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে, ইঞ্জিনেও জল ঢুকেছে।"

খালাসীরা বিপুল ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাদের গুম্ফবিহীন শ্মশ্রু বাহিয়া অঝোরে অশ্রুর ধারা ঝরিতে লাগিল। অসহায়কণ্ঠে তারা শুধু বলিতে পারিল—"ইয়া আল্লা, ইয়া খোদা।"

সারেঙ বলিল—"এবার যার যার 'লাইফ-বয়' নিয়া প্রস্তুত হও।"

সকলেই এক একটা করিয়া 'লাইফ-বয়' নিল, শুধু মিহির নিল না। এই প্রলয় ঝড়ে, এই অসীম বারিরাশির প্রবল উন্মত্ততার মধ্যে 'লাইফ-বয়' নেওয়া আর না নেওয়ার কোন পার্থক্য সে বুঝিল না। সারেঙ তার দিকে তাকাইতেই সে বলিল—"থাক্, আমার আর দরকার হবে না।"

বাহিরের প্রলয়োন্মত্ততা কিন্তু বাড়িয়াই চলিয়াছে। শুধু একটা তীব্র চাপা শো শো শব্দ—মন্থনপীড়িত বাসুকী যেন সহস্র ফণা দ্বারা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, পাতাল থেকে সহস্র সহস্র নাগিনী যেন রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

মিহিরের শরীর ক্রমেই অবশ, অসার হইয়া আসিতেছে। এইবার সে মরিবে, জাহাজ ডুবিবার পূর্বেই হয়ত মরিবে। বাহিরে প্রকৃতির রুদ্র রোষ, পবনের ভীম হুহুঙ্কার, সবই যেন শান্ত হইয়া আসিতেছে, পৃথিবী যেন তার নিকট থেকে দূরে বহু দূরে চলিয়া যাইতেছে, সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত চেতনা নিঃসাড় হইয়া আসিতেছে। পরম তৃপ্তিতে, গভীর শান্তিতে মিহিরের চক্ষু মুদিয়া আসিল।

বাতাসের একটা প্রবল ঝটকায় জাহাজখানা উল্‌টিয়া গেল।

[পঁচিশ]

২১শে শ্রাবণ দেবহূতির গায়ে হলুদ। অন্ততঃ তার পূর্বদিন আসিয়া পৌছিবার জন্য জিতব্রত বাবুর কাছে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। তিনি, তার স্ত্রী, বীরব্রত, সুবীথি, সকলেরই আসা চাই; বীরবলের নামেও পৃথক নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে।

ঠিক হইল যে জিতব্রত বাবু ও তার স্ত্রীর এখন যাওয়া হইবে না। সম্ভব হইলে তাঁরা বিবাহের সময় যাইবেন। এখন শুধু বীরব্রত, সুবীথি ও বীরবল যাইবে। গায়ে হলুদ হেরম্ব বাবুর বালীগঞ্জের বাড়ীতেই হইবে।

নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বদিন তারা তিন জনে আসিয়া পৌছিল। দেবহূতি সাদরে তাদের অভ্যর্থনা করিল। তার চোখ মুখ বিবাহের পূর্বে লজ্জারুণচ্ছটায় প্রদীপ্ত, অনাগত জীবনের রঙীন আনন্দে ভরপুর। কি এক অপূর্ব নেশায় সমগ্র দেহ মন মোহাবিষ্ট।

দেবহূতির এ নূতন রূপ বীরবলকে আরও মুগ্ধ করিল। তার প্রতিটি চালচলন, প্রতিটি কথাবার্তা, তাকে কি এক শ্রদ্ধামিশ্রিত আকর্ষণে তার কাছে টানিতে লাগিল।

বৈকালে-চা-পান-পর্ব সবে মাত্র সমাধা হইয়াছে, বীরবল দেবহূতীকে বলিল—"আমরা এখন একটু পিয়ানো বাজনা শুনব। ঢাকাতে ত সব যোগার-যন্ত্র ঠিক থাকতেও শেষ পর্যন্ত মিহির বাবু বাজনা শুনতে চাইলেন না।"

সুবীথি বলিল—"হ্যাঁ দিদি, আজ আর তোমাকে ছাড়ছি না। বেশ একটু জমকালো রকমের বাজাও, যাতে সমস্ত বাড়ীটা উৎসবের আনন্দে গম্‌গম্‌ করে ওঠে।"

দেবহুতি আস্তে আস্তে পিয়ানোর কাছে গিয়া বসিল। তার অঙ্গুলিস্পর্শে যন্ত্র যেন সর্বাঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া সেই স্বরলহরীতে ডুবিয়া রহিল। বীরবলের মনে হইল যেন শ্বেতবরণী বীণাপাণি স্বয়ং বীণাবাদন করিতেছেন। এমন একটা শুভ্রশুচি পরিবেশের সৃষ্টি হইল যে ভাষায় মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা পর্যন্ত তাদের নিকট অশোভন মনে হইল।

বীরব্রতের কিন্তু এসব ভাল লাগিতেছিল না। নেহাৎ পিতার পীড়াপীড়িতে এবং না গেলে সুবীথির যাওয়া হয় না এই জন্য তাকে আসিতে হইয়াছে, নতুবা বিবাহ ব্যাপারটা সে পছন্দ করে না। তার ধারণা বিবাহ করিলে কি পুরুষ, কি নারী, সকলেরই মনের সবলতা কমিয়া যায়, সংসারের তীব্র আকর্ষণে কোন মহৎ কাজ, কোন বৃহৎ কাজের জন্য যতখানি আত্মত্যাগ, যতখানি স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন তা তাদের পক্ষে অসম্ভব। নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেশের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সে পারে না, আকর্ষণ তাকে দুর্বল করিয়া ফেলে।

বীরবলের উপর গোড়া থেকেই তার কোন ভরসা ছিল না। কিন্তু যখন তার মনে সন্দেহ হইল যে, সুবীথি ও বীরবল বোধ হয় পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, তখন থেকেই সে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তবু কিন্তু আশা ছিল। কিন্তু দেবহুতির আবির্ভাব, তার আদর্শের প্রতি সুবীথির অবিচলিত শ্রদ্ধা, সঙ্গে সঙ্গে বীরবলের প্রতি অজ্ঞাত আকর্ষণ, সবে মিলিয়া বীরব্রতের মনে হইল সুবীথিকে সে হারাইবে। বীরব্রত লক্ষ্য করিয়াছে তার বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রণালীর উপর সুবীথির যেন পূর্বের মত দৃঢ় আস্থা নাই, তার মনের গোপন কোণে যেন নীড় বাঁধিবার প্রতি একটা অহেতুক আকর্ষণ সে অনুভব করিতেছে।

বীরব্রত সুবীথিকে খুবই ভালবাসে সত্য, কিন্তু দেশকে আরও বেশী ভালবাসে। তাই একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য সে মনে মনে প্রস্তুত হইল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বীরব্রত বলিল—"চল আমরা ছাদে যাই।"

দেবহুতি একটু হাসিয়া বলিল—"দেশসেবকের রুদ্ধদ্বারে চাঁদের আলো, মলয় বায়ু বৃথাই ত মাথা খোঁড়ে শুনেছি। পৃথিবীর যা কিছু কোমল, যা কিছু কমনীয় ও রমণীয় তা থেকে তারা সজোরে এবং সভয়ে মনকে দূরে রাখে পাছে মন দুর্বল হয়ে পড়ে। তা দেবীদার হঠাৎ ব্রতভঙ্গের সাধ কেন?"

বীরব্রত পরিহাসের সুরে বলিল—"ব্রতভঙ্গ আমার হবে না। তবে আমি শুধু দেখ্‌ব যে এমন কি শক্তি আছে এই চাঁদের আলোতে এবং মলয় বায়ুতে, যার জন্য মানুষ এক দিন যাকে জীবনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করে পরদিনই তা থেকে বিচ্যুত হতে সঙ্কুচিত হয় না।"

বীরব্রতের এই কথায় সুবীথির মুখ চোখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু অন্ধকার বলিয়া কেহ তার ভাবান্তর বুঝিতে পারিল না।

কি করিবে সে? যদিও বীরবলের এক দিনের কথায় তার চক্ষুতে জল আসিয়াছিল, তবুও আজ সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে দু'চারজন লোক দু'দশখানা বাজেয়াপ্ত বই পড়িয়া বা দু'একটা রিভলবার বা বোমার সাহায্যে ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াইতে পারিবে না। এ কর্ম-পদ্ধতিকে সে মনে প্রাণে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব মনে করিয়াছে। বিশেষ করিয়া দেবহুতির সংস্পর্শে তার ভিতর একটা গভীর পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে।

চার জনে ছাদে গেল। রূপজীবিনীদের মত মহানগরী সর্বাঙ্গ আলোকমালায় সুসজ্জিত করিয়া যেন কার অপেক্ষায় প্রতীক্ষমানা।

চাকর একটা মাদুর বিছাইয়া দিয়া গেলে সকলে উপবেশন করিল। প্রকৃতির এই মৌন নিস্তব্ধতায়—চাঁদের ম্লান আলো এক অস্পষ্ট স্বপ্নময় রাজ্যের সন্ধান দেয়। সমস্ত মুখরতা, সমস্ত কলভাষণ যেন আপনা থেকেই স্তব্ধ হইয়া আসে। একটা অখণ্ড নীরবতা সকলের মনের উপর ভারী হইয়া চাপিয়া বসে।

বীরব্রত সজোরে মন থেকে এই দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেবহূতিকে সম্বোধন করিয়া বলে—"আচ্ছা দেবি, সংসারে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণ অব্যাহত রেখে শান্তিময় নিরুপদ্রব জীবন যাপনই কি আমাদের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত মনে কর?"

দেবহূতি আজ এই প্রশ্নে একটু আঘাত পাইল। নারীজীবনের চরম পরিণতি বিবাহে, যেমন বৃক্ষের চরম পরিণতি ফলে—ইহা সে সমস্ত অন্তর দিয়া বিশ্বাস করে। লরেটোতে পড়িলেও প্রাচীন ভারতীয় নারীদের বিবাহিত জীবনের আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস তার কোন দিন বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। সে ঘোরতর অদৃষ্টবাদিনী। অদৃষ্ট প্রতিকূল হইলে মানুষের কোন চেষ্টাই যে সফল হয় না, প্রবল স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতরাইবার মত শুধু পরিশ্রমই সার হয়, অগ্রসর হওয়া যায় না—এই গভীর বিশ্বাস তার সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই সে বলিল—"আমাদের যতই কেন স্বার্থপর মনে কর না দেবীদা, অদৃষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে আমি পণ্ডশ্রম মনে করি। আমাদের উপর একজন নিয়ন্তা আছেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। সারেঙ জাহাজের হাল যে দিকে নিয়ন্ত্রিত করে, জাহাজ যদি তার বিপরীত দিকে যাবার চেষ্টা করে, তার ফল কি হয় জান ত?"

—বীরব্রত এবার জোরের সহিত বলিল—"এই অদৃষ্টবাদই দেশের সর্বনাশের মূল। সমগ্র জাতিটাকে নিষ্ক্রিয় অধ্যাত্মবাদের এক মোহময়

দুবিরস্তা এনে ফেলেছে। তুমি কি মনে কর, মানবজীবনের সমস্ত পাপ, সমস্ত অসদাচরণের জন্য তার অদৃষ্টই দায়ী ?"

দেবহুতি জোরের সহিত বলিল—"নিশ্চয়।"

বীরব্রত—"আচ্ছা বলতে পার, অদৃষ্ট যদি আমাদের জীবনের সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রিত করে, তবে আমাদের পাপাচরণে প্রবৃত্তও নিশ্চয় সে করায়। তার এরূপ প্রবৃত্তির কারণ কি ?"

দেবহুতি সহসা এর কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

বীরব্রত বলিল—"তবেই ছাখ, আমাদের কর্মের উপর তার কোন হাত নাই। কর্ম করব আমরা, অত্যাচার করব আমরা, অন্যায় করব আমরা, আর তার ফলভোগের বেলায় আর একজনের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেব, এতে কোন যুক্তি নেই।"

দেবহুতি—"তোমার এ যুক্তি যদি ঠিক মানতে পারলাম না দেবীদা। আমরা পাপাচরণে যে প্রবৃত্ত হই, সেও আমাদের পূর্ব-জন্মকৃত কর্মফলের জন্য। সেটাই ত আমাদের অদৃষ্ট। এ কথা যেমন প্রত্যেক মানবের জীবনে পৃথকভাবে প্রযোজ্য, তেমনি একটা জাতীয় জীবনে সমষ্টিগতভাবে প্রযোজ্য।"

বীরব্রত—"কিন্তু সৃষ্টির আদিতে ত কোন মানুষের পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল থাকে না। তখন তাকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত করায় কে ?"

দেবহুতি—"সৃষ্টির প্রথমের কথা তুলে তর্কের জোরে আমাকে কোণঠাসা করে ফেলতে পার, কিন্তু সৃষ্টির প্রথমে যে কথা খাটত, এখন সে কথা খাটে কি ? রাত্রের অন্ধকারে বসে সূর্য নাই এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেলেও দিবালোকে তাকে প্রত্যক্ষ করবার পর সে নজীর টেঁকে কি ?"

বীরব্রত এতক্ষণ নীরবে এই বাদানুবাদ শুনিতেছিল। এবার সে

বলিল—"যাই বলেন বীরব্রত বাবু, আমার মনে হয় দেশোদ্ধারের পথ ও নয়। আমাদের দেশের প্রাণশক্তি অশিক্ষিত জনসাধারণ। তাদের বাদ দিয়ে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকের চেষ্টায় দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা আমার মনে হয় হাস্যকর।"

আজ সুবীথির চোখে জল আসিল না, বা তাদের গুপ্ত সমিতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করায় সে ক্ষুব্ধ কি দুঃখিত হইল না। বরং সে বলিল—"আমারও মনে হয় দাদা, আমাদের অনুসৃত পথ হয় ত ভুল। জনসাধারণকে বাদ দিলে আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবে।"

বীরব্রত বুঝিল আর তর্ক করা নিষ্ফল। বীরবলকে সে পুরোপুরি কোন দিন তার দলে পায় নাই, এবার সুবীথিকেও হারাইল। কিন্তু সে ভগ্নোৎসাহ হইল না। মনে মনে স্থির করিল, যে ব্রত সে গ্রহণ করিয়াছে, সমগ্র বিশ্ব যদি তাকে ত্যাগ করে, তবুও তাতে সে অবিচলিত থাকিবে। সে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

[ছাব্বিশ]

দেবহূতির গায়ে হলুদ হইয়া গিয়াছে। সুবীথির বেশ লাগিল। জীবনের এদিকটার সঙ্গে তার কোন পরিচয় ছিল না। নারী-মনের কোমল প্রবৃত্তিগুলি তার মনে সুপ্ত ছিল। শিশুকাল থেকে দাদার উপদেশে ও আদেশে, দাদার আদর্শে চালিত হইয়া উপযুক্ত আলো ও বাতাসের অভাবে তার হৃদয়ের অন্তঃ পাপ্‌ড়ীগুলি শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

কিন্তু এ তার কি হইল? কি এক মায়াময় যাদুদণ্ডস্পর্শে সে, তার

নারীর সম্বন্ধে সহসা সজাগ হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ নারীদের উচ্ছ্বসিত আনন্দ কোলাহল, অজস্র হুলুধ্বনির মধ্যে দেবহূতির সমস্ত মুখখানি যখন আনন্দে, তৃপ্তিতে, সুখসরমে ব্রীড়াবনত ও আরক্তিম হইয়া উঠিল, তখন নারী-জীবনের এই এক নূতন দিকের বার্তা সুবীথির হৃদয়ে পৌঁছিয়া তার সমস্ত বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া তুলিল। সমগ্র পৃথিবী তার নিকট অপূর্ব সুষমাভরা মনে হইল, বীরবলের মুখের দিকে তাকাইতে তার লজ্জা হইল।

বৈকালের দিকে দেবহূতি উপনিষদে ডুবিয়া গেল। নবজীবনের এই প্রথম প্রারম্ভের মুখে সে যেন তার দেহমনে কী এক দুর্বলতা অনুভব করিতেছে। কী যেন এক ভয়মিশ্রিত আনন্দ, কী এক অননুভূত উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বীণার একটি তন্ত্রীতে আঘাত করিলে সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেমনভাবে কাঁপিয়া উঠে। তাই মনের এই আলোড়নে, এই অশান্ত ভাব দূর করিবার জন্য সে উপনিষদের আশ্রয় নিয়াছে।

সুবীথি আসিয়া প্রবেশ করিল। দেবহূতি মুখ তুলিয়া তাকাইয়াই বলিল—"বোস।" সে ধীরে ধীরে দেবহূতির পাশে বসিল।

সুবীথি দেবহূতির এ এক নূতন রূপ দেখিল। এ যেন অনুরাগত সুখস্বপ্নভরা দিনগুলির স্মৃতিতে বিভোর ব্রীড়ারক্তিম দেবহূতি নয়, এ যেন বৈদিক যুগের কোন ব্রহ্মবাদিনী ঋষিকন্যা, অপূর্ব তন্ময়তায় ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসমাহিতা। স্বর্গীয় দীপ্তিতে চোখ মুখ উদ্ভাসিত, এক পূত মৌন সুষমায় সর্বাঙ্গ বিমণ্ডিত।

সুবীথির মনে আজ প্রবল দ্বন্দ্ব। দাদা—তার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তার বাল্য ও কৈশোরের একমাত্র আদর্শ—সে আজ মনে আঘাত পাইয়াছে। কি করিবে সে? আজ নিঃসংশয়ে যে পন্থাকে সে

অনুপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার উপর আস্থা স্থাপন করে কি করিয়া? কিন্তু তবু ও তার দাদা! যে তাকে মায়ের চেয়ে বেশী ভালবাসে, মায়ের চেয়ে বেশী স্নেহ করে!

দেবহূতির হঠাৎ খেয়াল হইল যে সুবীথি অনেকক্ষণ তার পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি বীথি, আজ যে মুখখানা শুকনো শুকনো দেখছি।"

সুবীথি কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—"দিদি, তোমরা আমাকে একি কঠিন সমস্যায় ফেললে? এতদিন বেশ ছিলাম, দাদার মন দিয়ে ভাবতাম, দাদার চোখ দিয়ে দেখতাম, দেশোদ্ধারের স্বপ্নে সর্বদাই মশগুল থাকতাম। কিন্তু কেন আমার চিন্তাধারায় একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করলে? দাদের মধ্যে যে অটল বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।"

দেবহূতি একটু অবাক হইয়া বলিল—"কেন, কি হয়েছে? আজ হঠাৎ এমন কি ঘটল যাতে তোমাকে এত বিচলিত করেছে?"

সুবীথি—"বহুদিন থেকে নিজের অজ্ঞাতেই দাদার কর্মপ্রণালীর উপর আমার বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসছিল, যেমন করে প্রাচীন বৃক্ষের তলদেশ সকলের অজ্ঞাতে আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে। কিন্তু আজ হঠাৎ তা টের পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছি। তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি এ সমস্যার সমাধানের জন্য। তোমরা সব্বাই মিলে ষড়যন্ত্র করে কেন দাদার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিচ্ছ?"

দেবহূতি এবার বুঝিল সুবীথির মনের ক্ষত কোথায়। বুঝিল বীরবলের উপর নিজের অগোচরে যে আকর্ষণ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে, তাতে শঙ্কিত হইয়াই সুবীথি এত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। পরম স্নেহে কাছে টানিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে

বলিল—"নারীর মন পুরুষের চেয়েও বেশী উদার হয় কেন জান? তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভাবিত পরিবর্তনে। শৈশবে যে আবেষ্টনীতে সে পুষ্ট ও বর্ধিত হয়, যৌবনের প্রারম্ভে তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নূতন এবং অপরিচিত এক আবেষ্টনীতে গিয়ে পড়তে হয়। এতেই ত নারীজীবনের পূর্ণতা, এতেই ত তার পরিণতি—বদ্ধ জলার মত তার জীবন যদি এক যায়গায়ই সীমাবদ্ধ থাকে, তাতে উদারতা ও প্রসারতার সুযোগ কোথায়?"

সুবীথি ধীরে ধীরে বলিল—"কিন্তু আমার দাদা—দাদা যে মনে আঘাত পাবে।"

দেবহূতি—"এতে যদি দেবীদা আঘাত পায়, তবে বুঝ্‌বে সে আঘাত তার প্রাপ্য ছিল। শুচিবায়ুগ্রস্ত নারী যেমন সমস্ত অশুচি থেকে নিজেকে সতত বাঁচাতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে নিজের মনকে অধিকতর অশুচি করে, তেমনি পৃথিবীর প্রত্যেককে আঘাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা যদি কর, তাতে আঘাত কারও কম লাগবে না, মাঝ থেকে তোমার মন সতত আঘাত খেয়ে খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। বীণার তন্ত্রীতে ঘা না দিলে যেমন তা থেকে সুর ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে না, তেমনি আঘাত না পেলে মানব-মনের সমস্ত ভাববিলাস দূরীভূত করে তাকে কর্মে উদ্দীপিত করে তোলে না।"

দেবহূতির কথায় সুবীথি সান্ত্বনা পাইল না। সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

[সাতাশ]

মীরা যদিও জানিত মিহিরকে সে এ জীবনের মত হারাইয়াছে, তবুও মাদ্রাজ ফিরিয়া আসিবার পথে তার মনে একটা ক্ষীণ আশা উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল যে মিহির হয়ত তার মার মনোনীত মেয়েকে অপছন্দ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। উহাতে অবশ্য তার সঙ্গে মিহিরের মিলনের পথ সুগম হয় না, তবুও মানুষের আশা! যে রোগীর মৃত্যু আর এক ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিত, তার যদি আরও ৫।৭ দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে তাতে তার পিতামাতার মন যতখানি সান্ত্বনা পায়, মীরার মনও ততখানি সান্ত্বনার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখে—কই, মিহিরের কোন চিঠি ত আসে নাই। পথশ্রান্তি ভাল করিয়া বিদূরিত হইবার পূর্বেই চাকরকে মিহিরের বাসায় পাঠাইয়া দিল। সে আসিয়া খবর দিল সে বাসায় নূতন এক বিলাতী সাহেব আসিয়াছে। মিহির সে বাসায় থাকে না।

তবে কি মিহির নববধূ সহ নূতন বাসায় উঠিয়াছে? তবে কি সে বাস্তবিকই তাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে? হায়, মানুষের মন! মীরার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতে লাগিল। পরদিন মিহিরকে এক চিঠি লিখিল—

মিহির,

আমি কাল মাদ্রাজ ফিরেছি, আগের বাসায় তোমার খোঁজ নিয়েছিলাম, খবর পেলাম তুমি সেখানে নেই। যেখানেই থাক, আজ আমার সঙ্গে দেখা করো কিন্তু। কোন সঙ্কোচ নেই। বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকলে নববধূ সহই এসো। চায়ের নিমন্ত্রণ রইল।

ইতি—মীরা।

চিঠিখানা চাকরকে দিয়া দুপুরে মিহিরের অফিসে পাঠাইয়া দিল।

মিহিরের পর ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আসিয়াছে একজন ইংরেজ। মীরার চাকর সে-সব জানে না। সে ম্যাজিস্ট্রেটের আরদালীর কাছে চিঠিখানা দিয়া বলিল—"সাহেবকো পাশ দেনা। ইসকো জবাব ভি হাম্ মাংতা।"

সাহেব ত চিঠিখানা পাইয়া প্রথমে অবাক হইল। তারপর বুঝিল যে ইহা তার predecessor মিঃ রায়কে লেখা। লেখক হয়ত বহু দিন এ দেশে ছিল না, তাই সে শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা জানে না। কোন জবাব লিখিতে সাহেবের হাত সরিল না। সে মাদ্রাজ মেলের একটা কাটিং ইন্‌ভেলাপের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া চিঠিখানা বেয়ারার হাতে দিল।

মীরার চাকর চিঠিখানা নিয়া চলিয়া গেল।

মীরা কল্পনায় মিহিরের নব-বিবাহিতা স্ত্রীর ছবি মনে মনে আঁকিতেছে। নিশ্চয়ই সে অপূর্ব সুন্দরী—তার চেয়ে অনেক ফর্সা, চোখ মুখ নাক অনেক সুন্দর। তা নইলে সুমিত্রা দেবীর এত পছন্দ হইবে কেন? আচ্ছা, সে এখন কি করিতেছে? ইজিচেয়ারে নিজেকে এলাইয়া দিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতেছে, না মিহিরের অগোছাল জিনিষপত্র সব গুছাইয়া রাখিতেছে? যা এলোমেলো করিয়া মিহির তার জিনিষপত্র রাখে! দিনে অন্ততঃ তিন-চার বার করিয়া না গুছাইলে উপায় নাই। সে কি মীরার মত মিহিরের সমস্ত খুঁটিনাটির খবর রাখে? মিহির কোন তরকারীটা ভালবাসে, কি মাছ তার প্রিয়, কোন সাবান সাধারণতঃ সে ব্যবহার করে, এ-সব কি সে জানিয়া ফেলিয়াছে?

না, মিহির আজ না আসিলে সে নিজেই খোঁজ করিয়া তার বাসায় যাইবে। মিহিরের স্ত্রীকে সব শিখাইয়া দিয়া আসিবে, যাতে মিহিরের কোন অসুবিধা না হয়।

মিহির নিশ্চয়ই তার স্ত্রীকে মীরার কথা সব বলিয়াছে। আচ্ছা, মিহিরের স্ত্রী যদি তার উপস্থিতি পছন্দ না করে? যদি ভাবে যে এ তার কাছ থেকে তার স্বামীকে ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছে? তার অবজ্ঞামাখান ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি মীরা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু, তাহা হইলে ত মিহিরের অসুবিধা দূর হইবে না!

নাঃ—ও-সব সে গ্রাহ্য করিবে না। মিহিরকে সুখী করিতে, তার সামান্য একটু অসুবিধা দূর করিতে, সে এর চেয়ে ঢের বেশী অপমান সহ্য করিতে প্রস্তুত।

মীরা ভাবনা সাগরে ডুবিয়া গেল। সহস্রদিনের শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা তার স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তার সমগ্র অন্তর ব্যথায় টনটন করিতে লাগিল। শৈশব জীবনের একমাত্র নির্ভরস্থল, একমাত্র শান্তির আশ্রয়, মা তাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, যৌবনের প্রারম্ভে যে সহকার-তরুকে বেষ্টন করিয়া তার জীবন-বল্লরী মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছিল, তার আশ্রয় থেকে সে বিচ্যুত, ভূলুণ্ঠিত। বৃদ্ধ পিতার দিকে চাহিয়া তার ম্লান বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া সে তার নিজের দুঃখ ভুলিয়া যায়। যৌবনের শেষপ্রান্তে পত্নীহারা হইয়া তার প্রাণে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল, তার ব্যথা তিনি প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলেন একমাত্র কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া। পক্ষিমাতা যেমন আপন পক্ষপুটে সন্তানকে আচ্ছাদিত করিয়া তাকে সমস্ত বিপদ থেকে দূরে রাখে, তিনিও তেমনি করিয়া মীরাকে মায়ের স্নেহে, মায়ের মমতায় পালন করিয়াছেন, তার সামান্য তুষ্টির জন্য নিজের কোন অসুবিধা গ্রাহ্য

করেন নাই। সেই পিতার কথা মনে করিলে মীরা কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করিতে পারে না।

চাকরের পদশব্দে চমক ভাঙ্গিল। সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে মন থেকে জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেল মিহির কি লিখিয়াছে দেখিতে।

মিহির কি সস্ত্রীক আসিবে লিখিয়াছে? সে যে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে এবং স্ত্রীকে নিয়া আসিয়াছে বলিয়াই বাসা বদ্‌লাইয়াছে, এ বিষয়ে মীরা নিশ্চিত।

চাকরের হাত থেকে চিঠি নিতে গিয়া দেখে তার চিঠিখানা ফেরৎ আসিয়াছে। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই মাদ্রাজ মেলের কাটিংটুকু চিঠি থেকে পড়িয়া গেল। মীরা তুলিয়া নিয়া দেখে লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া—

Tragic Drowning Tragedy at Dhaleswari

The Dacca mail steamer on her way to Goalundo was capsized by a severe storm & turned upside down resulting in the death of all her passengers including Mr. Mihir Baran Roy a young I. C. S. of Madras while returning from home.

মীরার হাত থেকে চিঠিখানা পড়িয়া গেল। এ আঘাত এত অতর্কিত এবং এরূপ আকস্মিক যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত তার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিঃসাড়! সমগ্র চেতনা স্তব্ধীভূত হইয়া গেল। মিহির নাই! অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু মীরার সমগ্র বোধশক্তি তেমনি নিস্পন্দ! তেমনি নিশ্চেতন! সে যেন তখনও ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই, তার কি হইয়াছে! অর্থশূন্য দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া শুধু বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল এই আঘাতের গুরুত্বে ও আকস্মিকতায়

তার সমগ্র চেতনা বুঝি চিরকালের জন্য পঙ্গু হইয়া যাইবে, অহল্যার মত তার সমগ্র অস্তিত্ব বুঝি পাষাণে পরিণত হইবে।

মিঃ সেন ঘরে ঢুকিয়া মীরার নিষ্প্রভ পাণ্ডুর মুখ, ম্লান দীপ্তিহীন দৃষ্টি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। তার মেয়ের আবার কি নূতন দুর্ভাগ্য দেখা দিল? ভূপতিত চিঠিখানা পড়িয়া তিনি সব বুঝিলেন—হয়ত বা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলিলেন, বুঝি বা ভাবিলেন যে এবার তার মেয়ে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে।

[আটাশ]

দেবহূতি যখন মিহিরের মৃত্যুসংবাদ শুনিল তার চোখ দিয়ে এক-ফোঁটা জলও পড়িল না। সে ভাবিল এই তার নিয়তি। এই তার ভবিতব্যতা। বিবাহিত জীবনের মধুময় বা তিক্ত কোন আস্বাদই সে পায় নাই। মিহিরকে তার জীবনে মাত্র একবার দেখিয়াছে, কাজেই তার মৃত্যুতে নিজের একজন আত্মীয়ের মৃত্যুশোকও তার বাজে নাই। শুধু মনে মনে এই কথা সে ভাবিয়াছে যে আজ থেকে সে স্বামীহীনা। বিধিলিপি যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে তার জীবন মিহিরের সঙ্গে গ্রথিত করিয়াছে, পথচলা সুরু হওয়ার পূর্বে তা ছিন্ন হওয়ায় নিজের অদৃষ্টকে সে সেইজন্য দায়ী করিয়াছে, কিন্তু বন্ধনকে অস্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব।

হেরম্ব বাবু বলিয়াছেন—"দেবি! একটা কল্পিত ভাবকে স্থায়ী করে কেন সমস্ত জীবনটাকে ব্যর্থ করবে? মিহিরের সঙ্গে ত আর তোমার বিয়ে হয় নি। সম্বন্ধ হয়েছিল মাত্র। বিয়ে হয়ে গেলে না হয় একটা

কথা ছিল। মেয়েদের ত এরূপ কত সময়েই স্থগিত হয়, আবার ভেঙে যায়। তুমি যদি চাও ত আমি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের রায়ও এনে দিতে পারি যে, লালা লাজপৎ রায় বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর চেয়ে মিহিরের মৃত্যু তোমার জীবনের সঙ্গে অধিকতর সম্পৃক্ত নয়। এতে সম্পূর্ণ রক্ষণশীল হিন্দুশাস্ত্রমতে তোমার 'আবার বিয়ে বৈধ।'

দেবহূতি বলিল—"না বাবা! এ নিয়ে তুমি আমাকে অনুরোধ কর না। হিন্দু মেয়ের স্বামী একজনই থাকে। একবার যাকে স্বামী বলে জেনেছিলাম, আমরণ তিনিই আমার স্বামী। এর জন্য তুমি দুঃখ করো না! জীবনের সার্থকতার মাত্র একটা দিকই ত খোলা নেই? আমি জীবনের সার্থকতার অন্য পথ খুঁজে নোব।"

হেরম্ব বাবু আর কিছু বলিলেন না। ভাবিলেন আর কিছুদিন যাক। এই ঘটনা দেবীর মনে অস্পষ্ট হইয়া আসুক।

দেবহূতি কিন্তু খাঁটি বিধবা রমণীর মত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য আরম্ভ করিল। দিনে একবার নিরামিষ খায়, তাও নিজে রান্না করিয়া। গা থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল, তৈলহীন কেশরাশি রুক্ষ হইয়া জটার আকার ধারণ করিল।

হেরম্ব বাবু এসব অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি মনে হইল। তার পাশ্চাত্যাভিমুখী মনে এইসব স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্র সাধনা এত নিরর্থক ও অজ্ঞানতাপ্রসূত মনে হইল যে সমস্ত হিন্দুধর্মের উপর প্রচণ্ড ঘৃণায়, অকারণ বিদ্বেষে তার সমগ্র হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ লোক, তাই ভাবিলেন যে এ নিয়া এখন একটা হৈ চৈ করিলে ফল উল্টা হইবে।

দেবহূতি এবার সংস্কৃত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিল। পূর্বেই

ত্যা
ইহাতে যথেষ্ট দখল তার ছিল, কিন্তু জটিলতর বিষয়সমূহে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল শুধু টীকা এবং ব্যাখ্যায় রসাস্বাদন ও অর্থবোধ সম্পূর্ণ হয় না। তাই সে পিতাকে অনুরোধ করিল একজন সংস্কৃত পণ্ডিত রাখিয়া দিতে তাকে পড়াইবার জন্য।

হেরম্ব বাবু প্রথম ইহাতে তত গরজ করেন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন দেবহূতি এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প তখন বাধ্য হইয়া তাকে পণ্ডিতের খোঁজ করিতে হইল। কিন্তু যা তা পণ্ডিতে দেবীর মন উঠিবে না, অথচ কোন একজন বড় পণ্ডিত এরূপ শিক্ষাদানে রাজী হইবেন কি না এ বিষয়েও তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দু'একজনের কাছে তিনি রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাতও হইলেন।

একজন বিখ্যাত স্মৃতি শুনিয়া ক্রুদ্ধস্বরেই বলিলেন—"হ্যাঁ, মশায়, আপনারা ভেবেছেন কি বলুন ত? বিদ্যা বিক্রয় করব—তাও রমণীর কাছে? দেশের অবস্থা কি এতই শোচনীয় হয়েছে?"

একজন নৈয়ায়িক বলিলেন—"স্ত্রীলোকদের পূর্বপক্ষ করে বরং বিচারে আহ্বান করতে পারি, তাদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনাও বিশেষ প্রয়োজন বোধে করা চলতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে প্রবেশের সাহায্য—না, দেশের এত অধঃপতন এখনো হয় নাই।"

হেরম্ববাবু কিছুদিন চুপ করিয়া রহিলেন, দেবহূতিকে কিছু বলিলেন না কারণ সে শুনিলে মনে আঘাত পাইবে।

দেবহূতি কিন্তু নাছোড়বান্দা। কিছুদিন পরেই সে পিতাকে আবার পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। হেরম্ববাবু ফাঁপরে পড়িলেন, অনেক ভাবিয়াও কোন কূলকিনারা পাইলেন না। একদিন শুনিলেন বিক্রমপুর থেকে একজন খুব বড় পণ্ডিত কলিকাতায় আসিয়াছেন—সমস্ত শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য, অথচ যে অর্থহীন কঠোর অনুশাসন

ও শৃঙ্খল সমাজ দেহকে অক্টোপাশের মত জড়াইয়া আছে, তা থেকে তাকে মুক্ত করাই নাকি তার জীবনের ব্রত।

কলিকাতা সহরে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। দৈনিক বসুমতী তার কুৎসার এবং দৈনিক আনন্দবাজার তার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়া আজকালের মধ্যেই তাকে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিল। রক্ষণশীল পণ্ডিতের দল হিন্দুধর্মরক্ষায় তৎপর হইয়া উঠিলেন, সনাতন ধর্মরক্ষণী সনাতন ধর্মপ্রচারিণী প্রভৃতি বহু সভাসমিতি ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠায় পরস্পরের প্রশংসা ও বিখ্যাতি প্রচারের প্রতিযোগীতা লাগিয়া গেল।

পণ্ডিত ভগীরথ সার্বভৌম কিন্তু নির্বিকার। অত্যধিক নিন্দা বা প্রশংসা কোনটাই তাকে নিরুদ্যম বা আনন্দোৎফুল্ল করিয়া তোলে নাই। তবে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ-সংস্কারপন্থী বহু প্রতিষ্ঠানেরও সৃষ্টি হইল পণ্ডিত সার্বভৌমের আশীর্বাদ পুষ্ট হইয়া।

আন্দোলন অপ্রতিহত গতি লাভ করিল যেদিন রক্ষণশীল সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বিচারে সার্বভৌমের নিকট পরাজিত হইল। সেদিন সংস্কারপন্থীদল কোন আপত্তি, কোন নিষেধ শুনিল না। তারা সার্বভৌম মহাশয়কে নিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিল। কলিকাতা সহরের বার আনি লোক সেই শোভাযাত্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। অথচ অধিকাংশ লোকই জানে না যে এ শোভাযাত্রা কিসের।

সার্বভৌমের অদ্ভূত পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব বিচারশক্তি লোকের মুখে মুখে রূপায়িত ও পল্লবিত হইয়া এমন আকার ধারণ করিল যে কেউ বলিল ব্যাসদেব, কেউ বলিল শঙ্করাচার্য।

দেবহূতির ঘন ঘন তাগিদে হেরম্ববাবু একদিন ভয়ে ভয়ে সার্বভৌম

মহাশয়ের নিকট গেলেন। দেখিলেন অত্যন্ত ক্ষুদ্র কৃষ্ণকায় একটি শীর্ণ ব্রাহ্মণ, গলার পৈতাটি গায়ের রঙের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে শ্বেতচন্দনের প্রলেপ, পরিধানে আট হাতিধুতি, পায়ে তালতলার চটি ; তাহাকে বসিতে বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

হেরম্ববাবুর কল্পনা বাস্তবে রূঢ় আঘাত পাইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, এক তেজঃপুঞ্জকায় ব্রাহ্মণ—নয়নে প্রতিভার শাণিত দীপ্তি, কণ্ঠে কম্বুনির্ঘোত, আননে শিশুর সারল্য, ভঙ্গীতে বজ্রের দৃঢ়তা।

হেরম্ববাবু বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি বলিয়া কথাটা আরম্ভ করা যায় ? কি ভাবে বলিলে তিনি ও কিছু মনে করিবেন না, অথচ তাহারও একটা সুরাহা হয় তারই একটা মুসাবিদা মনে মনে করিতে করিতে যখন গলদঘর্ম হইয়া উঠিলেন, তখন সার্বভৌম মহাশয় প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"কি চাই আপনার ?"

হেরম্ববাবু একটু আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, আমার প্রয়োজনটা সম্পূর্ণরূপে আমারই ব্যক্তিগত, তাই বলতে একটু ইতস্ততঃ করছি। আপনি যদি আমাকে দু' মিনিট সময় দেন, তবে আমার বক্তব্যটা আপনার কাছে নিবেদন করতে পারি।"

সার্বভৌম মহাশয় বলিলেন—"আপনার যা বল্‌বার তা আপনাকে একটু সংক্ষেপে তাড়াতাড়ি বলতে হবে, কারণ আধঘণ্টার মধ্যেই আমার একটু বেরুনো দরকার।"

হেরম্ববাবু যথাসাধ্য সংক্ষেপে তার মেয়ের ইতিহাস বলিলেন, মিহিরের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ সুস্থির হওয়া থেকে সংস্কৃত অধ্যয়নস্পৃহা পর্যন্ত কিছুই বাদ দিলেন না। আরও বলিলেন—"আপনার সমাজ সংস্কারের কর্মপদ্ধতির মধ্যে আমার মেয়ের পুনর্বিবাহ যদি স্থান পায়,

তবে আপনার নিকট বিনীত অনুরোধ আমার মেয়ের বিয়ের একটা ব্যবস্থা আপনি করে দিন।"

সার্বভৌম মহাশয় বলিলেন—"এ আর শক্ত কি? আপনি ৩।৪ দিন পরে আসবেন। আপনার মেয়ের খুব ভাল সম্বন্ধ ঠিক করে দেব।"

এই বলিয়া তিনি উঠিবার উপক্রম করিতেই হেরম্ববাবু বিনীতকণ্ঠে বলিলেন—"কিন্তু মেয়ে যে বিয়ে করতে চায় না। সে যে বলে বিয়ে তার একবার হয়ে গেছে।"

সার্বভৌম মহাশয় এবার বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"কই এ কথা ত আপনি আমাকে বলেন নি? মেয়ে বিয়ে করতে না চাইলে আমি তার কি করতে পারি?"

হেরম্ববাবু বলিলেন—"সেজন্যই বিশেষ করে আপনার কাছে এসেছি। আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ মহত্ত্বের কথা সে শুনেছে। আপনি যদি তাকে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে বলেন তবে হয়তঃ সে অমত করবে না।"

সার্বভৌম মহাশয় বলিলেন—"আমার ভিজিট কিন্তু বত্রিশ টাকা।"

হেরম্ববাবু একটু অবাক হইয়া তাকাইতেই বলিলেন—"আপনার মেয়ের এটাও একটা মানসিক ব্যাধিই ত! শারীরিক ব্যাধিতে ডাক্তারকে ভিজিট দিতে হয়, আর মানসিক ব্যাধিতে দেবেন না? আমার দর্শনী বত্রিশ টাকা করে, তা সে ব্যাধি মানসিকই হোক, আর আদিভৌতিকই হোক।"

হেরম্ববাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বত্রিশ টাকা ভিজিটই আপনাকে দেব। আপনি কখন আমার ওখানে যাবেন, জানতে পারি কি?"

সার্বভৌম মহাশয় একটা নোটবুক বাহির করিয়া কি দেখিলেন।

তারপর বলিলেন—"আগামী কাল্য রাত্রি ৮টার সময় আমি যাব। আপনার ঠিকানা ?"

হেরম্ববাবু ঠিকানা বলিতেই তিনি নোটবুকে লিখিয়া নিলেন। হেরম্ববাবু নমস্কার করিয়া বিদায় নিলেন। রকম সকম দেখিয়া অধ্যাপনার কথাটা আর বলিতে সাহস করিলেন না। মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে সংস্কৃত শিক্ষাটা ত গৌণ, বাস্তবিকই যদি সার্বভৌম মহাশয় বিবাহে মত করাইতে পারেন, তবে বত্রিশ কেন, চৌষট্টি টাকায়ও লাভ।

(ঊনত্রিশ)

কলেজ থেকে বীরবল একটু তাড়াতাড়িই ফিরিয়াছে। শিশির ভাদুড়ী স্বদলবলে ঢাকায় আসিয়াছেন, মুকুল থিয়েটারে আজ অভিনয়। বহুকষ্টে বীরবল ও আরও ৬।৭ জন টিকিট যোগার করিয়াছে। সকলেই ঠাকুরকে তাড়া দিতেছে, ৬টার মধ্যে ভাত চাই, ৭টায় অভিনয় আরম্ভ। বীরবল রান্নাঘর থেকে একবার ঘুরিয়া আসিয়া দাড়ি কামাইতে বসিয়াছে। শিশির বাবুর অভিনয় সে দেখে নাই। আনন্দের উত্তেজনায় মুখের দু'তিন যায়গায় কাটিয়া ফেলিল।

বহু তাড়াহুড়ার পর অর্ধ-সিদ্ধ ডাল আর কাচা মাছ ভাজা দিয়া কোনমতে তারা যখন কয়েকগ্রাস খাইয়া উঠিল তখন ৭টা বাজিতে কুড়ি মিনিট বাকী। তাড়াতাড়ি জামাটা মাথার ভিতর ঢুকাইয়া বোতাম আঁটিতে আঁটিতে সকলে সকলরবে বাহিরে আসিল। তখন ৬টা ৪৫

মিনিট। সর্বনাশ! সেখানে পৌঁছাইতে পৌঁছাইতেই যে ৭টা বাজিবে, যায়গা পাওয়া যাইবে ত?

সবেমাত্র ত'র ছুটি'ত ছুটি'ত কলেজের মেন গেট দিয়া বাহিরে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময়ে কে ডাকিল, "বীরবল বাবু?"

বীরবলের সারা মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। কেরে বাপু, এমন সময় পিছু ডাকে? কটমট করিয়া পিছনে তাকাইতেই দেখে সুবীথি— সঙ্গে বাসার চাকর গোবিন্দ।

বীরবলের সাথীরা সবাই অবাক হইয়া তাকাইতেই সে তাড়াতাড়ি বলিল—"তোমরা একটু দাঁড়াও ভাই আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।"

সুবীথি বলিল—"ওদের একেবারে বিদায় করেই আসুন। আমার বক্তব্য বলতে একটু সময় লাগবে।"

বীরবল বন্ধুদের দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল—"তোমরা ভাই এগোও, আমার হয়তঃ একটু দেরী হবে। আমার টিকিটখানা বরং আমার কাছে দিয়ে যাও, আমি কিছুক্ষণ পরে আসছি।"

বন্ধুরা পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তারপর যার কাছে সকলের টিকিট ছিল, সে বলিল—"এই নাও ভাই তোমার টিকিট, আর একখানা টিকিট তোমাকে দিতে পারলে, বাস্তবিকই নিজেদের ধন্য মনে করতাম। কি করব, অদৃষ্ট। আচ্ছা নমস্কার।"

বীরবলের মুখ রাঙ্গা হইল। নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া ধীরে ধীরে সুবীথির কাছে আসিল।

সুবীথি বলিল—"কোথাও যাচ্ছিলেন নাকি?"

বীরবল—"হ্যাঁ-না-তা এই একটু থিয়েটারে যাচ্ছিলাম। আজ মুকুলে শিশির বাবু প্লে করবেন কি না?"

সুবীথি—"আহা, তা হলে ত আপনাকে আটকে রাখা খুবই অন্যায় হয়ে গেছে।"

বীরবল—"না, না, এমন আর কি? ও ত আমি আর একদিনও শুনতে পারব।"

সুবীথির চক্ষুতে কৌতুক ভাসিয়া উঠিল। সে বলিল—"শিশির বাবু নাকি দলবলসহ কালই চলে যাচ্ছেন?"

পলকে বীরবলের মুখ রাঙ্গা হইল। সে বলিল—"সে রকমই ত শুনেছিলাম।"

সুবীথি—(চাপা হাসি হাসিয়া) "তবে আপনি আর একদিন শুনবেন কি করে?"

বীরবল—(অপ্রস্তুত হইয়া) "না, না, ও আর এখন কি, না হয় নাই শুনলাম।"

সুবীথির ভিতরকার আদিম এবং চিরন্তন নারীপ্রবৃত্তি তৃপ্ত হইল।

সুবীথি—"চলুন আমাদের বাসার দিকে যেতে যেতে আমার যা বলবার তা বলব।"

বীরবল—"তার চেয়ে আসুন না আমরা এই ভিক্টোরিয়া পার্কে বসি। আপনি এতটা হেটে এসেছেন, আপনার জিরুনোও হবে, আমাদের কথাবার্ত্তাও হবে।"

ততক্ষণে তারা ভিক্টোরিয়া পার্কের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। উভয়ে পার্কে ঢুকিয়া পড়িল। বীরবলের মনে ক্ষীণ আশা যদি বক্তব্য শীঘ্র শেষ হইয়া যায়, তবে সুবীথিকে আজকের মত বিদায় দিয়া সে থিয়েটারে ঢুকিবে। চাকর গোবিন্দ গেটের সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

উভয়ে একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার

সহরের সর্বাঙ্গে এক অস্পষ্ট কুহেলী মাখিয়া দিয়াছে, রাস্তায় ধূসর ম্লান আলোতে রহস্যের আভাস।

বীরবলের ভিতরকার সুপ্ত যৌবন যেন প্রদোষের পাণ্ডুর ম্লানিমায়, প্রকৃতির নীরব মুখরতায় একমুহূর্তে সচকিত হইয়া উঠিল। সুবীথির মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল সেখানে বিশ্বের সমগ্র নারী সৌন্দর্যের মধুরতা—উর্বশী, হেলেন, ক্লিওপেট্রা, তিলোত্তমা, সব এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

সুবীথি সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, বুঝিয়াই লজ্জায় রাঙা হইয়া দৃষ্টি নত করিল। তার বক্তব্য আর বলা হইল না, বীরবলও গরজ করিয়া শুনিতে চাহিল না। পাছে প্রসঙ্গান্তরে তাদের এই মধুময় নীরব দুর্লভ মুহূর্তগুলি উড়িয়া যায়, পাছে এই মধুময় রঙীন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, তাই তাহারা নীরব বিশ্বপ্রকৃতির নীচে বিপুল নীরবতায় স্তব্ধ হইয়া রহিল।

শুধু অলক্ষ্যে কখন যে সুবীথির হাতখানা বীরবলের হাতের মধ্যে গিয়াছে, কখন যে উভয়ে ঘেসাঘেসি করিয়া বসিয়াছে, তাহা কেউ টের পায় নাই।

বাহির থেকে গোবিন্দ হাঁকিল—"দিদি ঠাকরুণ, এবার উঠুন। রাত ত অনেক হল। এরপর মা আবার গালাগাল দিবেন।"

উভয়ের একসঙ্গে চমক ভাঙ্গিল। সুবীথি তাড়াতাড়ি হাত টানিয়া দূরে সরিয়া বসিল। বীরবল অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া গোবিন্দের দিকে চাহিয়া ভাবিল, গোবিন্দ উভয়ের হাত ধরাধরি দেখিয়াছে কি না।

সুবীথি উঠিয়া বলিল—"হ্যাঁ চল গোবিন্দ। বাবা! এত দেরী হয়ে গেছে। তুমি আরও আগে আমাদের ডাকনি কেন?"

গোবিন্দ—"দিদি ঠাকরুণ, আমি বাইরের বেঞ্চিতে একটু ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম উঠেই আপনাদের ডাক দিয়েছি।" বলিয়াই সে আবার আড়মোড়া দিয়া হাত পা টান করিল।

সুবীথি—"চলুন না বীরবল বাবু, আমাদের একটু এগিয়ে দিবেন। যা রাত হয়েছে, গোবিন্দের সঙ্গে একা যেতে বাস্তবিকই আমার ভয় করে।"

বীরবল—"চলুন।"

উভয়ে পাশাপাশি কিয়দ্দুর চলিলে বীরবল বলিল—"কই আপনি কেন এসেছেন তাত বললেন না?"

সুবীথি একটু বিস্মিত ভাবে বলিল—"সে কি, বলিনি। আমিত ভেবেছি যে তা গোড়ায়ই বলা হয়ে গেছে। হায়, হায়, যে জন্য এসেছি তা বলতেই ভুল।"

সুবীথির বলবার ভঙ্গী দেখিয়া বীরবল হাসিয়া উঠিল। নিঃসঙ্গ নিরালায় এই ছুটি যুবকযুবতীর মনে যে রহস্যময় ও মোহময় ভাব ভারী হইয়া নামিয়াছিল এই লঘু হাস্যে তাহা তরল হইয়া গেল।

বীরবল বলিল—"সত্যি আপনার এমন কি দরকার থাকিতে পারে যে একটা চাকর না পাঠিয়ে, বা চিঠি না লিখে নিজে এতদূর হেটে এসেছেন। আর আমাকে ডাকিয়ে পাঠালেই ত আমি যেতাম।"

সুবীথি আবেগ কম্পিত স্বরে বলিল—"না বীরবল বাবু, নিজের মুখে আপনাকে বলব বলেই এতদূর হেটে এসেছি। কাল আমার জন্মদিন। এ খবরটি কি আর কারও মুখ দিয়ে শুনলে আপনি তৃপ্তি পেতেন? কাল ভোর আটটায় আপনাকে আমাদের বাড়ীতে হাজির হতে হবে কিন্তু। আমার জন্মদিনের অনারে কাল আপনার কলেজ বন্ধ।"

বীরবল—"এতো আমার পরম সৌভাগ্য। কাল নিশ্চয়ই আমি

যাব, তবে ভো়র আট্টায় একটু বেশী তাড়াতাড়ি হয় দশটার মধ্যে যাব।”

সুবীথি—“না, না, আট্টার মধ্যেই যেতে হবে। সাড়ে আট্টায় আমরা পিকনিকে রওনা হব যে। নারাণগঞ্জের রাস্তায় আট্ মাইল মোটরে গিয়ে নদীর পারে সুন্দর একটি যায়গা আমরা ঠিক করেছি। আপনি না আসা পর্যন্ত কিন্তু আমাদের রওনা হওয়া বন্ধ।”

বীরবল—“আচ্ছা, আমি আট্টায়ই যাব। আপনাদের সঙ্গে আমোদ করবার এই অযাচিত সুযোগ দান করায় আমি আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ সুবীথি দেবী। নমস্কার।”

বীরবলের আর এত রাত্রে সুবীথিদের বাড়ী ঢোক্‌বার ইচ্ছা ছিল না, তাই দরজা থেকেই বিদায় নিল।

বীরবল যেন রাস্তা দিয়া উড়িয়া চলিল। কোথায় গেল তার শিশির ভাতুড়ীর থিয়েটার, কোথায় গেল তার অপেক্ষমান বন্ধুগণ। সমস্ত স্মৃতি বিস্মৃতিতে ডুবিয়া গেল, শুধু ভাসিয়া রহিল একটা মধুর আবেশের অস্পষ্ট মাদকতা, সুবীথিকে ঘেরিয়া একটা অনমুভূত আনন্দ শিহরণ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক সে সহরের উপর দিয়া উড়িয়া বেড়াইল। কোন কোন রাস্তা অতিক্রম করিল বা সহরের কোন কোন অংশে ঘুরিল, তাহার কিছুই সে বলিতে পারে না। উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া উঠিলে তার থিয়েটারের কথা মনে পড়িল। ঘড়ি দেখিল সাড়ে নয়টা। কি সর্ব্বনাশ, এত রাত্রি পর্যন্ত সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়াছে? সে কি পাগল হইয়াছিল?

তাড়াতাড়ি সে মুকুল থিয়েটারের দিকে রওনা হইল।

[ত্রিশ]

বীরবল যখন সুবীথিদের বাড়ী আসিয়া পৌছিল তখন বীরব্রত ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত। বীরব্রত আজ সাত আট দিন হইল কি একটা কাজে কলিকাতা গিয়াছে, অধিকাংশকেই সে চিনিল না, কিন্তু আশ্চর্য হইল এই দেখিয়া যে সবাই তোকে চেনে।

সুবীথি কলকণ্ঠে তাকে অভ্যর্থনা করিল। তারপর অন্যান্য সকলকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বীরবলকে টানিয়া ভিতরে নিয়া গেল।

তাদের গুপ্ত সমিতির অধিবেশনের সেইঘর। সমিতি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর বীরবল আর সে ঘরে ঢোকে নাই। তবু বহুদিনের স্মৃতি যেন হুড়মুড় করিয়া তাকে চাপিল ধরিল। চমক ভাঙ্গিল যখন সুবীথি তার পায়ের উপর গড় হইয়া প্রণাম করিল। বীরবল চমকিত হইয়া তাকাইতেই সে গাঢ়স্বরে বলিল—"আজকের দিনে আপনাকে একটা প্রণাম করতে না পেলে আমার সমস্ত দিনটাই ব্যর্থ মনে হোত।"

বীরবল হকচকিয়া গেল। এরজন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সুবীথির জন্মদিনে একটা কিছু উপহার দেওয়ার কথা তার মনে ছিল। সে ভাবিয়াছিল পিক্‌নিক্ থেকে ফিরিবার পথে কোন কাজের অজুহাতে সে নামিয়া পড়িবে এবং পছন্দমত কোন জিনিষ কিনিয়া নিয়া সুবীথিদের ওখানে যাইবে। এমন বিপদে সে জীবনে কখনও পড়ে নাই। একবার ভাবিল যে দশটাকার নোটখানা সে সঙ্গে আনিয়াছে উপহার কিনিবার জন্য তাহাই সুবীথিকে দিয়া দেয়, পরক্ষণেই ভাবিল উহা যে শুধু হাস্যকর হইবে তা নয়, অত্যন্ত অপমানকরও হইবে। বায়স্কোপের

নীরব ছবির মত অত্যন্ত দ্রুতবেগে এই সব চিন্তা তার মনের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু ভাবিবার ত সময় নাই। যা কিছু করিতে হইবে এই মুহূর্তেই। হঠাৎ সে হাত থেকে একটি আংটী খুলিয়া সুবীথির হাতে পরাইয়া দিয়া বলিল—"আপনার জন্মদিনে এই আমার ক্ষুদ্র প্রীতি উপহার।" তারপর অত্যন্ত অকস্মাৎ ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল।

আংটিটীর সামান্য একটু ইতিহাস আছে। বীরবলের দাদা সুবল ভিন্নগ্রামের এক স্বর্ণকারের পুত্রকে চিকিৎসা করিয়া হঠাৎ ভাল করিয়া ফেলে। অবশ্য ভাল হইবে এটা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। স্বর্ণকার তাকে আশাতীত অর্থ দিতে চাহিলে সে তার স্ত্রীর জন্য একটি আংটি চায়। স্বর্ণকার তার সমস্ত কৃতিত্ব নিয়োজিত করিয়া একটি অত্যন্ত সুন্দর জড়োয়া বসানো আংটি তৈয়ার করিয়া দেয়। দু'একটি জড়োয়া খুলিয়া যাওয়ায় সেগুলি আবার ঠিকমত বসাইয়া দিবার জন্য তার বৌদি তিনচার দিন হয় এটি তার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে।

বৌদির আংটি অন্যকে দিলে তাকে কি কৈফিয়ৎ দিবে, অত্যন্ত মূল্যবান এই আংটির মত আর একটি গড়াইয়া দিবার টাকা সে যোগার করিতে পারিবে কি না, এসব চিন্তা সে তখন করে নাই।

সুবীথি লজ্জারক্তিম মুখে আংটিটির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। নীরবে নিজের অঙ্গুলীতে বুঝিবা কিছুক্ষণ বীরবলের তপ্তস্পর্শ অনুভব করিল, তারপর ধীরে ধীরে আংটিটি খুলিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া ক্ষুদ্র দলটির মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

সুবীথি আসিতেই অপেক্ষামান দলটি হৈ হৈ করিয়া বাসে উঠিল। জিনিষ পত্র আগেই তোলা হইয়াছিল।

বীরবলের পাশে বসিয়াছিল সুবীথির ব্রাহ্মিকা বন্ধু অর্চিসেন।

ব্রাহ্মসমাজে বীরবলের বক্তৃতার পর অন্যান্য অনেকের মত সে ও বীরবলকে প্রশংসমান দৃষ্টিদ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছিল। তখন থেকেই তার খুব ইচ্ছা এঁর সঙ্গে আলাপ করে, কিন্তু সুযোগ ঘটে নাই। আজ বীরবলকে পাশে পাইয়া সে খুব উৎসাহিত হইল।

মোলায়েম কণ্ঠে বলিল—"নমস্কার বীরবল বাবু।"

বীরবল অর্চি সেনকে চিনে না। তবুও মুখে একটু মৃদু হাসির রেখা টানিয়া বলিল—"নমস্কার!"

অর্চি সেন—"ব্রাহ্মসমাজে আপনার বক্তৃতা আমার খুব ভাল লেগেছিল, যেমন বলার ভঙ্গী তেমনি সতেজ ও সরস কণ্ঠস্বর। আচ্ছা, আপনার লেখার অভ্যাস টভ্যাস আছে ত?"

বীরবলের লেখার অভ্যাস খুবই আছে। কতদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত কবিতার ছন্দ ও মিল খুঁজিতে গলদঘর্ম হইয়াছে। ছোটগল্পের প্লট খুঁজিতে গিয়া সব সময়েই দেখিয়াছে কোন না কোন লেখক বহুপূর্বেই তার সৃষ্ট প্লট দ্বারা গল্প লিখিয়া বসিয়া আছে। উপন্যাসের চেষ্টা সে এখন পর্যন্ত করে নাই, কারণ অতখানি ধৈর্য তার নাই। সদ্য বিবাহিত যুবক যেমন তার নব পরিনীতা পত্নীর চিঠি সযত্নে অত্যন্ত গোপনে, লোক চক্ষুর অন্তরালে রক্ষা করে, বীববলও তেমনি তার লেখাগুলি অত্যন্ত সংগোপনে লুকাইয়া রাখিত। কিন্তু সে খবর সে প্রকাশ করে কি করিয়া?

বীরবলের নীরবতা তার স্বীকৃতিই সূচিত করিল। অর্চি সেন মৃদু হাসিয়া বলিল—"আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি আপনি একজন লেখক। কোন্ বিষয়ে আপনি সাধারণতঃ বেশী লিখে থাকেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস না নাটক?"

বীরবলের অবস্থা তখন খুবই অসহায়। কোনটা বলিবে? কোন

একটা কবিতা বা গল্পই সে শেষ করিতে পারে নাই। কবিতার অধিক কোনরকমে মিলাইয়া তার সব ধৈর্য শেষ হইয়া যায় গল্পের শেষ কি ভাবে করিবে তাহা সে ভাবিয়াই পায় না। নাটক বা উপন্যাসে এখনো সে হাত দেয় নাই। অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বলিল—"তা-তা-আমি-আমি কোনটাই লিখতে পারি না। তবে-তবে এই ছোট গল্প বা কবিতা লিখতে দু'একবার চেষ্টা করেছি মাত্র।"

অর্চি সেন—"তা আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা বীরবল বাবু, গায়ক ও সাহিত্যিক কি একই প্রকৃতির? ভাল গায়ক যেমন কখনও একবারে স্বীকার করে না যে সে গাইতে পারে, ভাল সাহিত্যিক ও কি সেরূপ একবারে স্বীকার করতে পারে না যে সে লিখতে পারে?"

বীরবল এমন অবস্থায় জীবনে কখনো পড়ে নাই। সে কি করিয়া বুঝাইবে যে তার সাহিত্যিক প্রয়াস ছোট শিশুর প্রথম হাঁটিবার প্রয়াসের মতই। শিশু যেমন দাঁড়াইতে গেলেই মাথা টলিয়া পড়িয়া যায় সে ও তেমনি একটা কিছু আরম্ভ করিয়াই দেখে যে কতদূর গিয়া আর তা অগ্রসর হয় না। সে মনে মনে যতই ভাবে যে তার ব্যর্থ সাহিত্য প্রয়াস সে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবে, তবু ও কেমন করিয়া যে তার মুখ দিয়াই তাহা বাহির হইয়া যায় ইহাতে সে বিস্মিত হয়। নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট সত্য কথা বলার মত মানসিক সবলতা না থাকায় আর ও দুইএক ক্ষেত্রে সে এরূপ অপ্রস্তুত হইয়াছে, তবু মনের এই দুর্ব্বলতাকে জয় করিতে পারে নাই।

অর্চি একটু হাসিয়া বলিল—"কেন এত চেপে যাচ্ছেন বলুন ত? আপনি একবারে স্বীকার করলেও আমাদের কাছে আপনার কদর একটুও কমত না।"

বীরবলের এবার মুখ ফুটিল। ধার করা হাসিতে মুখখানা একটু

উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—"সত্যি মিস্ সেন, আমি সাহিত্যিক একেবারেই নই। নিজের খেয়াল মত অবশ্য দু'একদিন লিখতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে শিশুর নুড়ি নিয়ে খেলার মত। সে নিজে কোনটাকে বাড়ী, কোনটা মানুষ, কোনটা বিড়াল মনে করে কিন্তু সাধারণ মানুষের চক্ষুতে তা নুড়িই।"

অর্চি সেন—"আচ্ছা সে নুড়ি না কি তা আমরা বুঝব। আমার একটা অনুরোধ আগে শুনুন ত? না বললে কিন্তু চলবে না।"

অর্চি সেনের অনুরোধ কি হইতে পারে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া বীরবল আরও ঘাব্ড়াইয়া গেল।

অর্চি সেন—"আমাদের পাড়া থেকে আমরা কয়েকজন মিলে একখানা হাতের লেখা কাগজ বের করেছি। নাম নবাগতা। এতে আমরা আপনার একটা লেখা চাই।"

বীরবল কিছু বলিবার উপক্রম করিতেই সে বলিল—"আরও শুনুন, প্রত্যেক সোমবার আমাদের একটি সাহিত্য সভা বসে। গাড়ীতে আমরা যে কয়জন আছি আপনি ছাড়া আর সকলেই তার সভ্য, এমন কি বীথিও। তাতে কবিতা, গল্প প্রভৃতি পঠিত ও আলোচিত হয়। আপনাকে ও তার সভ্য হতে হবে কিন্তু।"

বীরবল—"কোন সাহিত্য সভায় সাহিত্যালোচনার মত যোগ্যতা আমার নেই। বিশেষতঃ আমার সময় ও বড় কম।"

অর্চি সেন অভিমান মিশ্রিত ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—"আমি পূর্ব্বেই জানি আমার অনুরোধ আপনি রাখবেন না। আমাদের মত অসাহিত্যিকদের ছেলেমানুষী সভায় সময় নষ্ট করা কি আপনার মত লোকের সাজে?"

বীরবল লজ্জিত হইয়া বলিল—"না, না, সে কি কথা? বরং আপনাদের সাহিত্য সভায় যোগ দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

আমি বলছিলাম যে আমার সময় আজকাল খুবই কম, বিশেষতঃ পরীক্ষা ও এসে গেল। আপনারা যদি আনন্দিত হন, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সভায় সানন্দে যোগ দিব।"

অর্চি সেন—"তবে আসছে সোমবার আমাদের বাড়ীতে সভা বসবে, যাবেন কিন্তু। অমনি সেই সভায় আপনার একটি কবিতাও আমরা শুনব।"

গাড়ী নির্ধারিত স্থানে আসিয়া পৌছিল। সোমবারের সভায় কবিতা পাঠ করিতে হইবে এই চিন্তায় বীরবলের মানসিক উৎসাহ একেবারে অন্তর্হিত হইল। নূতন করিয়া একটা কিছু লিখিতে চেষ্টা করিবে, না অর্ধসমাপ্ত কোন কবিতা শেষ করিতে চেষ্টা করিবে? নূতন করিয়া লিখিলে কি বিষয় লিখিবে, কোন ছন্দে লিখিবে?

বীরবল অবশ্য বেশীক্ষণ এ সব চিন্তা করার সময় পাইল না। গাড়ী থামিতেই তাকে সকলের সঙ্গে নামিতে হইল। পরমুহূর্তেই ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে সমস্ত দলটি কলরব মুখর হইয়া উঠিল। কোন সংকোচ নাই, কোন দ্বিধা নাই, কোন কৃত্রিম মানসিক জড়তা নাই শুধু অফুরন্ত, অনাবিল আনন্দ প্রবাহ। যেন একদল শিশুর ক্রীড়া-কোলাহলে সমস্ত নদীতট মুখরিত হইয়া উঠিল।

সুবীথি বীরবলকে ডাক দিল—"বীরবল বাবু, শুনুন।"

বীরবল আসিতেই বড় একটা বালতী দিয়া বলিল—"নদী থেকে এক বালতী পরিস্কার জল আনুন ত?"

বীরবল সোৎসাহে জল আনিতে ছুটিল। জামাকাপড় অর্দ্ধেক ভিজাইয়া একপাটি জুতা বালির মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া সে যখন জল নিয়া পৌছিল তখন তার চেহারা দেখিয়া সুবীথির হাসিও পাইল, দুঃখও হইল।

ওদিকে অর্চি সেন ডাকিল—"বীরবলবাবু একবার শীগ্‌গির।" বীরবল ছুটিয়া যাইতেই সে বলিল—"এই কাঠ কখানা একটু কেটে দিন ত? কুড়লখানা বোধ হয় গাড়ীতে আছে।"

বীরবল দৌড়াইয়া গাড়ী থেকে কুড়ল নিয়া আসিল। কাঠকাটা যে এত শক্ত তাকি সে জানে? কুড়ুল নিয়া কাঠের উপর প্রাণপণ বলে কোপ্ মারিল। কাটের আধ ইঞ্চি বায়ে কুড়ুল মাটির মধ্যে প্রায় দুই ইঞ্চি বসিয়া গেল। অনেক কষ্টে টানিয়া তুলিয়া একটু ডান দিক ঘেসিয়া কোপ্ মারিল। এবার ডানদিকে প্রায় তিনইঞ্চি দূরে কুড়ুল মাটির মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। অনেক টানাটানিতে কোনমতে কুড়ুল তুলিল। এইরূপ মিনিট দশেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর কাঠখানার দুদিকে যখন দু'টা বড় গর্ত হইয়া উঠিল, তখন সঙ্গের চাকরটি বীরবলের হাত থেকে কুড়ুল নিয়া খুব সহজেই কাঠ ফাঁড়িয়া দিল।

অপ্রস্তুতের লজ্জায় বীরবলের মুখ তখন আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে কতক্ষণ? শোভা রায় মাছের কালিয়ায় নূন দিয়াছে কিনা ভুলিয়া গিয়াছে। সে ডাকিল—"বীরবলবাবু, এদিকে একবার।"

বীরবল যাইতেই সে বলিল—"দেখুন ত, কালিয়াটায় নূন দেওয়া হয়েছে কি না?"

রান্না শেষ হবার পর শোভা রায়ের ভাই মনি রায় যখন প্রস্তাব করিল—"চলুন এবার নদী থেকে সবাই স্নান করে আসি।"

চাকরকে রান্না করা জিনিষের কাছে বসাইয়া সকলে নদীতে গেল। এতগুলি তরুণ তরুণীর সজীব প্রাণবন্ততায় নদীসৈকত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। জীবনের এক অস্বাদিত দিকের সঙ্গে নূতন পরিচয় লাভ করিয়া বীরবলের সমগ্র অন্তর বার বার পুলক শিহরণে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তার মনে পড়িল—

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ নারী কণ্ঠের কাকলি।
মৃণাল ভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে
আলাপে প্রলাপে হাসি উচ্ছ্বসে
আকাশ উঠিল আকুলি॥

বেলা তিনটার সময় সমগ্র দলটি যখন গাড়ীতে উঠিল, তখন বীরবলের মনে হইল আজকের দিনটি তার জীবনের সার্থকতম দিন।

[একত্রিশ]

আগামী কল্য সোমবার অর্চি সেনের বাড়ীতে সাহিত্য বৈঠকে বীরবলের কবিতা পাঠ করিতে হইবে। সন্ধ্যার পর বীরবল খাতা পেনসিল নিয়া বসিয়া গেল। এ সময়টায় হোষ্টেল অপেক্ষাকৃত নির্জন থাকে, কারণ প্রায় সকলেই হয় বেড়াইতে না হয় বায়স্কোপ দেখিতে যায়।

বীরবল প্রথম তার অসমাপ্ত কবিতাগুলি একে একে দেখিল। কিন্তু না—এর একটীও সময়োপযোগী না। নূতন করিয়াই লিখিতে হইবে। কি বিষয়ে লেখা যায়? সভ্যগণকে স্বগত সম্ভাষণ জানাইয়া সভায় একটা প্রশস্তি পাঠ করিবে, না বঙ্গবাণীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া একটা কবিতা লিখিবে, না চাঁদের কিরণ, মলয় বায়ু, কুহুধ্বনি মিশ্রিত করিয়া দ্ব্যর্থবোধক একটা প্রেমের কবিতা লিখিবে? ভাবিল প্রেমের কবিতাই একটা চেষ্টা করা যাক।

মলয় বায়ু মোদের আয়ু
বড়ই খাটো।
চাঁদের আলো আগুন জ্বালো
লাফিয়ে ওঠো।

না—'খাটো'র সঙ্গে 'ওঠো'র চমৎকার মিল হইলেও এখানে লাফিয়ে ওঠো'র কোন মানে হয় না। আচ্ছা লাফিয়ে ওঠো না দিয়ে যদি 'জ্বলিয়ে ওটো' দেওয়া যায় কেমন হয়?

চাঁদের আলো আগুন জ্বালো
জ্বলিয়ে ওটো।

এরই বা কি মানে হইল? কিন্তু—

চাঁদের আলো আগুন জ্বালো
হৃদয় মাঝে।

হ্যাঁ, এইবার অর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু মিল যে হইল না। 'বড়ই খাটো'টা বদ্‌লাইলে কেমন হয়। যদি এই রকম করা যায়—

মলয় বায়ু মোদের আয়ু
সকাল সাঁঝে।

এতে ছন্দ ঠিক থাকে বটে কিন্তু অর্থ যে কিছুই হয় না। বীরবল বিরক্ত হইয়া পেন্‌সিল কামড়াইতে লাগিল। এই জন্যই সে কবিতা লিখিতে বসে না। মিল যদি হয় ত অর্থ হয় না, অর্থ যদি হয় ত মিল হয় না। হঠাৎ মনে হইল, আচ্ছা, 'মোদের আয়ু'র যায়গায় যদি 'হ্রস্ব আয়ু' দেই? একটু দীর্ঘ হয় তা কিই বা করা যায়? 'হ্রস্ব আয়ু' দিলে ত একেবারেই হ্রস্ব হইয়া যায়। নাঃ—আর ভাবা যায় না। দু'লাইনেই যদি এত ভাবিতে হয়, তবে সমস্ত কবিতাটা কিরূপে শেষ হইবে? অই থাক—

মলয় বায়ু হরিছ আয়ু
সকাল সাঁঝে।
চাঁদের আলো আগুন জ্বালো
হৃদয় মাঝে।

তারপর কি লেখা যায়?

কোকিল শুধু ডাকে কুহু—
কিসের লাগি?

না—'শুধু'র সঙ্গে 'কুহু'র মিল ভাল হয় না। 'শুধু'র সঙ্গে কি কি মিল হয়? শুধু, মধু, বিধু, সাধু, বধু, সীধু, নিধু, মাধু—না এর একটাও লাগসই মনে হইতেছে না। আচ্ছা 'কুহু' ঠিক রাখিয়া 'শুধু' শব্দটা পাল্টাইলে কিরকম হয়? কুহুর সঙ্গে কি মিল দেওয়া যায়? বীরবল খাতার একপাশে লিখিল—কুহু, উঁহু, বহু, রুঁহু, লহু, যবহু, সঁবহু কই, এর একটাও ঠিক হইল না। সে আবার চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গেল। হঠাৎ মনে হইল আচ্ছা 'মুহু' হইলে কেমন হয়?

কোকিল মুহু ডাকে কুহু
কিসের লাগি?

হ্যাঁ, এইবার ঠিক হইয়াছে। কিন্তু এর পর? নাঃ—বীরবল আর পারে না। মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুতে যেন এই মিলের চেষ্টা তীব্রভাবে আঘাত করিতেছে। কিছুক্ষণ সে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল। মনকে একটু বিশ্রাম না দিলে আর একটা শব্দও সে লিখিতে পারিবে না। কপালের দু'পাশের শিরা দু'টা দপ্ দপ্ করিতেছে। কিন্তু কোথায় বিশ্রাম? মনের মধ্যে কবিতার লাইন কয়টা ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। বীরবল তাড়াতাড়ি লিখিল—

কিসের আশে কোন মানসে
রজনী জাগি।

না—'রজনী জাগি' একটু দীর্ঘ মনে হইতেছে। আর কি দেওয়া যায়? 'নিশি জাগি'—না, হ্রস্ব হইয়া গেল। 'রাত্রি জাগি' হ্যাঁ, এইবার ঠিক হইয়াছে। কিন্তু উপরের দুইটা ত ঠিক হইল না। বীরবল মনের মধ্যে তীব্রভাবে হাত্‌ড়াইতে লাগিল। না—উহাদের একেবারেই বদ্‌লাইতে হইবে। কিন্তু, কি দেওয়া যায়? হ্যাঁ, এইবার ঠিক হইয়াছে।

কই সে পিয়া অবশ হিয়া
রাত্রি জাগি।

বীরবল সবটা একসঙ্গে পড়িল—

মলয় বায়ু হরছ আয়ু
সকাল সাঁঝে
চাঁদের আলো আগুন জ্বালো
হৃদয় মাঝে।
কোকিল মুহু ডাকে কুহু
কিসের লাগি?
কই সে পিয়া? অবশ হিয়া
রাত্রি জাগি।

হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া খাবার ঘণ্টা পড়িয়া গেল। বীরবলের তখন মনে পড়িল যে বৈকালে সে কিছুই খায় নাই। তাড়াতাড়ি খাতা পেন্‌সিল রাখিয়া সে খাইতে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর বীরবল একটু বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইল,

বিশৃঙ্খল চিন্তারাশিকে সুশৃঙ্খল করিবার জন্য, তারপর আবার আসিয়া খাতা পেন্‌সিল নিয়া বসিল। দু'একজনে আসিয়া গল্প জমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তার মুখে চোখে এমন বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল যে তারা আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

বীরবল ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ তার মনে হইল মিলের ও ছন্দের এরূপ ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া গদ্য কবিতা লিখলে কিরকম হয়? তাইত এই অত্যন্ত সহজ উপায় তার সামনে পড়িয়া রহিয়াছে, আর সে মিলের জন্য গলদ্ ঘর্ম হইতেছে? অন্যান্য বহু অসমাপ্ত কবিতার মত এই কবিতাটিও পরিত্যাগ করিয়া বীরবল দ্বিগুণ উৎসাহে গদ্য কবিতা রচনায় লাগিয়া গেল। কতকটা লিখিয়াই তার মনে হইল এ-ত বড়ই সহজ! মিলের জন্য খুঁজিতে হয় না, ছন্দের জন্য ভাবিতে হয় না, অর্থের জন্যও ততটা অবহিত না হইলে চলে। বীরবল লিখিল—

উৎসারিত আনন্দের বিপুল ঔৎসুক্য
অভ্রংলিহ ম্লান।
দীর্ঘপক্ষ্ম আঁখিতারকার
সজল জলদধারা নৈঃশব্দ্য ঝঙ্কার
অবলুপ্ত অটবীর বিক্ষুব্ধ জড়তা।
বাণীর কমলবন বিমর্দিত মত্তকরী কর নিপীড়নে
বপ্রক্রীড়া পরিণত গজ প্রেক্ষণীয়।
পরিস্ফীত বেদনায় ক্ষীণার্ত মদির
স্থিরচ্ছায় ক্রমশীর্ষ কম্পিত চঞ্চল।
রজনীর তমিস্রার বীভৎস বিস্তার
ধরণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে গীর্বাণের গর্বিত আকুতি;
গর্ভলীন জৈবাতৃক প্রমত্ত সরমে
দুঃসহ আবেগভরে ক্লান্তিতে প্রলুপ্ত।

এই পর্যন্ত লিখিয়া বীরবলের মনে হইল যে এই ত চমৎকার হইতেছে। কবিতা লিখিবার এইরূপ সহজ উপায় থাকিতে সে কিনা সন্ধ্যা থেকে এই দীর্ঘ সময় ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়াছে? কবিতাটি শেষ করিয়া নিশ্চিত মনে যখন সে শয়ন করিল, তখন রাত্রি বারোটা।

[বত্রিশ

সোমবার বৈকালে বীরবল আসিয়া সুবীথিদের দরজায় ধাক্কা দিতেই সুবীথি বাহির হইয়া আসিল। সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই এতক্ষণ বীরবলের অপেক্ষা করিতেছিল।

দু'জনে রাস্তায় নামিতেই সুবীথি বলিল—"আপনি ত আচ্ছা লোক বীরবলবাবু। কবিতা লিখতে পারেন, গল্প লিখতে পারেন, অথচ আমাদের একদিনও বলেন নি। আমরা কি আপনার এতই পর, না আপনার কবিতা বা গল্প আমরা গিলে ফেলতুম।

সুবীথির কণ্ঠে অভিমানের সুর দেখিয়া বীরবল তাড়াতাড়ি বলিল—"না—না সুবীথিদেবী, সে কি কথা? আমার লেখা কারও শোন্‌বার উপযুক্ত নয় বলেই এতদিন গোপন রেখেছিলাম। সেদিন আপনার বন্ধু অর্চি সেন যে রকম পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন, তাই বাধ্য হয়ে কথা দিয়েছি।"

সুবীথি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝা গেছে, আপনি যা আমাদের আপন মনে করেন! আপনি কবিতা লিখতে পারেন, এটা অর্চি আগে জানবে কেন? সেই আপনার বড় বন্ধু হোল, না?"

বীরবল সুবীথির এরূপ ছেলেমানষী অভিমান দেখিয়া মনে মনে

একটু হাসিল—বুঝি বা একটু তৃপ্ত ও হইল। তরুণীর এরূপ অভিমানে যে মাধুর্য থাকে, তাহা সে প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিল। সুবীথির দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকাইয়া বলিল—"আপনাকে আপন মনে করি কি না, তা কি এখনও আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে, সুবীথি দেবী? সে কি আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি?"

বীরবলের সে দৃষ্টির সামনে সুবীথির চোখ আপনা থেকেই নত হইল, জন্মদিনে বীরবল প্রদত্ত আংটিটি চোখের সম্মুখে জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল।

প্রসঙ্গান্তরে যাইবার জন্য সে বলিল—"বীরবলবাবু, আমার জন্মদিনে আপনি যে আংটিটি দিয়েছেন, সকলেই তার খুব প্রশংসা করেছিল। আপনি মিছামিছি এত টাকা খরচ করলেন কেন বলুন ত? কি অন্যায় আপনার?"

বীরবল আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"যাকে সব দিলেও দেওয়ার আকাঙ্খা থেকে যায়, তাকে সামান্য একটা আংটি দিয়ে এমন আর কি বেশী দিয়েছি? সুবীথি দেবী, আপনাকে যে আমি—"

সুবীথি তাড়াতাড়ি বলিল—"বীরবলবাবু, কই, আপনি যে কবিতাটি লিখে এনেছেন তাত দেখালেন না?"

বীরবল মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিল এবং সুবীথির সম্মুখে ঐরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার জন্য মনে মনে লজ্জিতও হইল। পকেট থেকে কবিতাটি বাহির করিয়া তার হাতে দিল।

সুবীথি কবিতাটি পড়িয়া প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রধান কারণ ইহার একবর্ণও সে বুঝে নাই।

দরজায় অর্চি সেন দাঁড়াইয়াছিল; অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে নিয়া

গেল। বিস্তৃত ধবধবে ফরাসের উপর দশবারোটি তরুণ তরুণী বসিয়া। এদের প্রায় সকলকেই সে পিক্‌নিকের দিন দেখিয়াছিল।

বীরবল ও সুবীথি বসিতেই সভার কার্য আরম্ভ হইল। বি-এ, ক্লাসের একটি ছাত্র সভাপতি। তিনি বীরবলকে সকলের নিকট পরিচিত করাইতে গিয়া বলিলেন—"উদীয়মান সাহিত্যিক বীরবল-বাবুকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আজ আমরা ধন্য। তিনি এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়ে আমাদের গৌরবান্বিত করেছেন। তার স্বরচিত একটি কবিতাদ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ করা যাক।"

বীরবল আরক্তমুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"আমি সাহিত্যিক নই এবং সাহিত্য সভায় কিছু বলার যোগ্যতাও আমার নেই। ছোট ছেলে যেমন পেন্‌সিল দিয়ে খাতায় বা স্লেটে আঁচড় কাটে আমি তেমনি অবসর সময়ে খাতায় সেরূপ আঁচড় কাটি মাত্র। তাই আপনারা আমাকে এরূপ সম্মান প্রদর্শন করায় আমি অতিশয় লজ্জা বোধ করছি। যাক্‌ যখন শুনবেনই তখন সেই ব্যর্থপ্রয়াসের একটু নমুনা দিচ্ছি।"

এই বলিয়া বীরবল পকেট থেকে একখানা কাগজ বাহির করিয়া পড়িল—

"উৎসারিত আনন্দের বিপুল ঔৎসুক্য
অভ্রংলিহ ম্লান ইত্যাদি।"

বীরবলের সতেজ ও সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কবিতাটির শব্দ ঝঙ্কার শ্রোতাদের কর্ণে অপূর্ব মনে হইল, সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিল। কিন্তু কেহই ভাবিতে চেষ্টা করিল না যে এই কবিতার কোন অর্থ আছে কি না। বর্তমান যুগে কবিতার অর্থ নিয়া যে কেহ মাথা ঘামায় না, তাহা বীরবল জানিত না, জানিলে অবশ্য এই কবিতা পড়িতে তাঁর এত সংকোচ হইত না। অর্থযুক্ত কবিতা যে বাজারে অচল,

ভাবের অস্পষ্ট কুহেলী, কখনও বা ভাবশূন্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বর যে মানুষের সচেতন মনকে অবহেলা করিয়া অবচেতন মনের দ্বারে গিয়া আঘাত করে তাই তাহার এত আদর।

বীরবল নিজেও একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল; কারণ সে যে কবিতা লিখিতে পারে এবং সেই কবিতা শুনিয়া যে কেউ প্রশংসা করিতে পারে এ ধারণা তার ছিল না। বিশেষতঃ গদ্য কবিতা যে কবিতার দ্বার এত সহজে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় তাহাতেও সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। কবিতা লিখিতে গেলে আগে যে দুর্ভাবনা এবং কসরৎ তার করিতে হইত, তাহা থেকে মুক্তি পাইবার এত সহজ পন্থা যে বিদ্যমান, ইহাতে সে কবিতা লিখিতে উৎসাহিত বোধ করিল।

সেদিন সাহিত্য সভায় আর কি আলোচনা হইল বা সে কখন কি বলিল, তাহা বীরবলের খেয়াল নাই। কবি খ্যাতি এত সহজ এবং অনায়াসলভ্য দেখিয়া তৃপ্তির আনন্দে সে ভরপূর। আলোচনা শেষে যে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, মাত্র সেই সময়ে সে তার স্বপ্নরাজ্য থেকে বাস্তবে ফিরিয়া আসিল।

সুবীথিকে বাড়ী পৌছাইবার পথে দু'জনেই সমস্ত পথ নীরবে অতিবাহিত করিল।

[তেত্রিশ]

পণ্ডিত ভগীরথ সার্বভৌম নির্দ্দিষ্ট সময়ে হেরম্ববাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। হেরম্ববাবু দেবহুতিকে পূর্বাহ্নেই জানাইয়া রাখিয়া

ছিলেন যে দেশ বিশ্রুত পণ্ডিত সার্বভৌম মহাশয় রাত্রি আট্টায় তাদের বাড়ীতে পদধূলি দিবেন।

হেরম্ববাবু তাকে ঘরে নিয়া বসাইতেই দেবহূতি আসিয়া প্রণাম করিল। সার্বভৌম মহাশয় সবিস্ময়ে দেখিলেন ব্রহ্মচর্যের পূত গরিমায় এই তরুণীর বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত। কি এক নৈর্ব্যক্তিক সংসার বিমুখতা তার সর্বাঙ্গ বৈরাগ্যমণ্ডিত করিয়াছে। একবার ভাবিলেন এঁকে সংসারে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করা হয়ত অন্যায়। পরমুহূর্তেই মনে হইল যে না, ইহা তাহার মানসিক দুর্বলতা। এরূপ একটা তেজস্বী মন এরূপ একটা নির্লিপ্ত হৃদয়কে সংসারে প্রবিষ্ট করাইলে, তাতে সংসার যথেষ্ট লাভবান হইবে। তিনি দেবহূতিকে বসিতে বলিলেন।

দেবহূতি ধীরে ধীরে উপবেশন করিলে তিনি কোন ভূমিকা না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা, তুমি নাকি বিয়ে করতে চাচ্ছ না?"

দেবহূতির মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইল। সে বুঝিল তার পিতা তাকে বিবাহে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সার্বভৌম মহাশয়কে আনাইয়াছেন। তার জীবনকে সুখময় করিবার জন্য পিতার এই একান্ত চেষ্টায় এই সুবিপুল পিতৃস্নেহের পরিচয়ে তার সমগ্র অন্তর স্নিগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে সে? তার জীবনের সুখের সন্ধান যে চিরাচরিত পথে নয়। সে নীরবে মাথা নত করিয়া রহিল।

সার্বভৌম মহাশয় তার দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ প্রশান্ত স্বরে বলিলেন—
—"আমি বুড়ো মানুষ, আমার কাছে লজ্জা কি মা? কিন্তু তোমার ত বিয়ে হয় নি?"

দেবহূতি এবার মুখ তুলিল। সার্বভৌম মহাশয় দেখিলেন সে মুখের প্রতিটি রেখা সুস্পষ্ট দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। বুঝিলেন এতদিনে তিনি একটি খাঁটি হীরার সন্ধান পাইয়াছেন।

সে ধীরে ধীরে বলিল—"আপনি বিখ্যাত পণ্ডিত, সমস্ত শাস্ত্র করায়ত্ত; আপনাকে আমি আর কি বুঝাব। আপনাদের শাস্ত্রেই ত বলেছে যাকে মনে মনে একবার স্বামী বলে ভাবা যায়, আমরণ তিনিই স্বামী। বিয়েটা ত একটা লৌকিক প্রথা মাত্র।"

সার্বভৌম মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"না রে পাগলী, বিয়েটা শুধু লৌকিক প্রথা নয়। নারায়ণ সাক্ষী রেখে সেখানে যে মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়। সে বন্ধন অচ্ছেদ্য।"

দেবহূতি—"তা হলে বাগ্‌দত্তা শুধু একটা কথার কথা? বলুন, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, আমার সংশয় নিরাকরণ করুন। আমাদের শাস্ত্রে কি এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর নেই, যে মনে মনে একজনকে স্বামীত্বে বরণ করে সারাজীবন তার অপেক্ষা করেছে।"

সার্বভৌম মহাশয় একটু বিস্মিত হইলেন। এরূপ অবিচলিত অটল দৃঢ়তা, এরূপ নিস্বার্থ ভোগশূন্য নির্লিপ্ততা ইহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিবার চেষ্টাও তার অপরাধ বলিয়া মনে হইল। তবু তিনি বলিলেন—"আরে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের অনুশাসনও যে বদ্‌লাচ্ছে। মনুর স্মৃতি কি এ যুগে অচল নয়? অথচ রঘুনন্দনের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত তার অনুশাসনই অনড় ছিল।"

দেবহূতি—"ওসব শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না আপনি প্রকাণ্ড পণ্ডিত, আপনি বুঝালে হয়ত আমি বুঝতে বাধ্য হব যে আমার পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু শাস্ত্রের চেয়ে কি মন বড় নয়? আমার মন যে বলছে আবার বিয়ে করলে আমি দ্বিচারিণী হব।"

সার্বভৌম মহাশয় বলিলেন—"কিন্তু বিয়ে করেও ত তুমি মা সংসারের প্রকৃত কল্যাণ করতে পার। আদর্শ গার্হস্থাশ্রম যে সংসারের সাধারণ লোকের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।"

দেবহুতি—"আমি ত সংসার ছেড়ে দিচ্ছি না। গার্হস্থ্যাশ্রমেই আমি থাকব, সংসারের লোকের ছোটখাট সুখদুঃখ দূর করতেই আমার ক্ষুদ্র শক্তি যথাসাধ্য নিয়োগ করব। সংসারের কিছুই আমি ত্যাগ করব না, শুধু দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণের অনুরোধ আপনি করবেন না।"

সার্বভৌম মহাশয় দেবহুতিকে আর বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি বুঝিলেন এ মেয়েটি সাধারণ মেয়েদের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। উঠিবার সময় তার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—"তুমি আমাকে আজ বড় আনন্দ, বড় তৃপ্তি দিলে মা। বর্তমানযুগেও যে তোমার মত মেয়ে আমাদের দেশ থেকে একেবারে লোপ পায় নি, ইহা এই দুর্ভাগা দেশের পক্ষে বড়ই আশার কথা। আমি আশীর্বাদ করছি, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতের বহু উর্দ্ধে তোমার মনকে অবিচলিত নিষ্ঠায় অকম্পিত রেখে, তুমি তোমার জীবনকে সার্থকতার দিকে চালিত করতে পারবে। কোন কুটিল বাঁধা, কোন মলিন কলুষতা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আচ্ছা, আসি মা।"

দেবহুতি সার্বভৌম মহাশয়ের পদধূলি নিয়া বলিল—"আমার খুব ইচ্ছা আমি একটু সংস্কৃত পড়ি। বাবাকে বলেছিলাম, তিনি বলেন, আমি স্ত্রীলোক বলে কোন পণ্ডিতই আমাকে সংস্কৃত পড়াতে রাজী হল না। আপনি যদি দয়া করে এর একটা ব্যবস্থা করে দেন।"

সার্বভৌম মহাশয় বাহিরে আসিতে আসিতে বলিলেন—"সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই মা। আমি এ ব্যবস্থার ভার নিলাম। যদি কাকেও না পাই, নিজে বসে তোমাকে পড়িয়ে যাব। তোমরা যে গার্গী মৈত্রেয়ীর জাত।"

হেরম্ববাবু বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। সার্বভৌম মহাশয় আসিতেই তাহার পায়ে বত্রিশটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। সার্বভৌম

মহাশয় গভীরস্বরে বলিলেন—"আপনার মেয়েকে বিয়েতে মত করাতে পারলাম না! তবে এও আপনাকে বলে যাই সংসারে খুব অল্প কয়েকটি লোক থাকেন যাদের জীবনের ধারা সাংসারিক আশা আকাঙ্ক্ষা, ভোগবাসনার বহু উর্ধ্বে, আপনার মেয়েও সেই জাতের। এঁদের সংসারে টেনে না আনলে তাকে সংসারের লোকসানের চেয়ে লাভই অনেক বেশী। এ টাকাও আমি নেব না, কারণ এ আমার প্রাপ্য নয়।"

হেরম্ববাবু একটু অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। সার্বভৌম মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"আমার কথায় কি আপনি বিস্মিত হচ্ছেন? ভাবছেন, এত বড় একটা পণ্ডিত এক ফোঁটা একটু মেয়েকে স্বমতে আন্‌তে পারল না? কিন্তু সত্যিই পারলাম না। মনের একাগ্র বিশ্বাসের সঙ্গে তর্ক চলে না। আপনার মেয়ের বিশ্বাস যেরূপ জলন্ত, মানসিক দৃঢ়তা যেরূপ অবিকম্পিত, তাতে তাকে জোর করে সেই বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করা অপরাধ মনে হল। বরং আশীর্বাদ করে এলাম, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এরূপ অবিচলিত নিষ্ঠা বজায় রেখে জীবনকে যেন সে সার্থক করে তুলতে পারে।"

হেরম্ববাবু—"কিন্তু আপনিই বলেছিলেন, আমার মেয়ের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।"

সার্বভৌম—"গৃহস্থাশ্রম ও শাস্ত্রসম্মত, তা বলে সন্ন্যাস নেওয়াটা কি অপরাধের? যাক্, ও নিয়ে আপনার মেয়েকে পীড়াপীড়ি করে কোন ফল হবে না। আর এক কথা আপনার মেয়ে সংস্কৃত শিখতে চায়। এজন্য সে আমার কাছে একজন অধ্যাপকের কথা বলেছে। উপযুক্ত কাউকে পেলেই আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব! মাসে গোটা পঞ্চাশেক টাকা কিন্তু এজন্য আপনার খরচ করতে হবে।"

হেরম্ববাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমার এই একটি মাত্র মেয়ে। বড় সাধ ছিল, ভাল একটি ছেলে দেখে এর বিয়ে দিয়ে একে সংসারী করব। আমার যা কিছু আছে মেয়ে জামাইকে দিয়ে জীবনের বাকী দিন কয়টা একটু নিরুপদ্রব শান্তিতে কাটাব। তা ভগবান সে আশায় বাদ সাধলেন। পণ্ডিত মশায়, সেদিন আপনাকে অধ্যাপকের কথা বলতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সাহস পাই নি। আপনি দয়া করে যখন নিজ থেকেই এর একটা ব্যবস্থা করতে চাচ্ছেন, তখন আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। টাকার জন্য আপনি ভাববেন না।"

সার্বভৌম—"আমি ত নিজ থেকেই বললাম, আমি একজন উপযুক্তমত পণ্ডিত পেলেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, আসি নমস্কার।"

হেরম্ববাবু প্রতিনমস্কার করিয়া নীরবে সন্ধ্যার ধূসর আবহাওয়ার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

[চৌত্রিশ]

বংশাল রোডে ছোট ছোট ছেলেদের মার্বেল খেলা নিয়া যে ঝগড়া হয়, তারই ফলে সমগ্র সহরে সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়াইয়া পড়ে। খুন জখম যথেচ্ছভাবে চলিতে থাকে। মুকুল থিয়েটারের সত্বাধিকারী প্রকাশ্য দিবালোকে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হইন। বাড়ী ঘর জ্বালান, লুন্ঠন, হত্যা সমগ্র সহরে এক ভীষণ

বিভীষিকার সৃষ্টি করে। স্কুল, কলেজ, অফিস, ব্যাঙ্ক, পোষ্টাফিস সব বন্ধ।

বীরবল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। হোষ্টেলের ছেলেদের নিয়া এক নগররক্ষী বাহিনী গঠন করিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সহরের বিভিন্ন হিন্দুপল্লীর বিপন্ন ও অসহায় নরনারীর ধনপ্রাণরক্ষণে আত্মনিয়োগ করিল। তাদের দেখাদেখি সহরের বিভিন্ন স্থানে এরূপ বিভিন্ন রক্ষীবাহিনী গঠিত হইয়া দুর্বৃত্ত গুণ্ডাদের বাধা দিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রি দশটার সময় বীরবল খাইতে বসিয়াছে, হঠাৎ একটি ছেলে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া খবর দিল যে মালীটোলায় এক ভীষণ দাঙ্গা বাঁধিয়াছে। তিনটা খুন হইয়াছে, এখনই না গেলে মহিলাদের জীবন ও সম্ভ্রম বিশেষ বিপন্ন হইবার আশঙ্কা। বীরবল বসিবার পীড়ি থেকে লাফাইয়া উঠিয়া হুইসিল দিল, মুহূর্তের মধ্যে ছেলেরা সব লাঠি নিয়া হাজির। আর কালবিলম্ব না করিয়া তারা মালীটোলার দিকে দৌড়াইল।

বীরবল যখন দলবলসহ আসিয়া পৌছিল তখন গুণ্ডারা দলবদ্ধভাবে একটা বাড়ীর দরজার গোড়ায় কুড়ুল মারিতেছে, আর মুহুর্মুহু সোল্লাস চীৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিতেছে।

কলেজের ছেলেদের উপর এই সব গুণ্ডার দল গোড়া থেকেই ভয়ানক ক্ষিপ্ত। কারণ তাদের দুর্বৃত্ত নৃশংসতায় যেখানে যেখানে তারা প্রবলভাবে বাধা পাইয়া হটিয়া আসিয়াছে, সেখানেই বাধা আসিয়াছে এইসব ছেলেদের কাছ থেকে। কাজেই তারা সংখ্যায় অনেক বেশী থাকায় এবং ছেলেদের খুব অল্পবয়স্ক ও দলে কম দেখিয়া ছেলেরা কিছু বলার পূর্বেই ইহারা দরজা ভাঙ্গা বন্ধ রাখিয়া সকলে

একযোগে তাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে কি দারুণ ভয়াবহ দৃশ্য! একদিকে ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত নৃশংসদের পৈশাচিক চীৎকার, অন্যদিকে তরুণ কয়েকটি কিশোরের আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণ চেষ্টা। জানালা খুলিয়া উপর থেকে মহিলারা এই দৃশ্য দেখিয়া বারবার ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, আর মনে মনে ভগবানের কাছে এদের রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। দু' একজন পুরুষ যারা ভিতরে ছিলেন, তারা ছাদে উঠিয়া 'পুলিশ' 'পুলিশ' বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় পুলিশ! তাদের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ব্যর্থ আশঙ্কায় দিক্‌দিগন্তে মিলাইয়া গেল, নিষ্ফল ক্রোধে গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া ঘরের মধ্যে পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভুলেও একবার এই তরুণ কিশোর কয়টির অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাদের সাহায্যার্থ ঘর থেকে বাহির হইবার কথা চিন্তা করিলেন না।

উত্তেজনার প্রথম উগ্রতাটা কমিয়া গেলে এক ভদ্রলোকের হঠাৎ মনে পড়িল তার কাছে ত একটা বন্দুক আছে, এবং দাঙ্গার সূত্রপাত থেকে সেটা সর্বক্ষণ টোটাভরা থাকে। তিনি মুহূর্তের মধ্যে বন্দুক নিয়া ছাদে গেলেন। কিন্তু নিশানা করিতে গিয়া দেখেন হাত ভয়ানক কাঁপিতেছে, উত্তেজনায় না ভয়ে, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন ফাঁকা আওয়াজ করাই নিরাপদ। টোটা খুলিতে গিয়া দেখেন যে হাতের কাঁপুনী আরও বাড়িয়া গিয়াছে, টোটা খোলার ক্ষমতাও নাই।

এদিকে গুণ্ডাদের চীৎকার ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ভদ্রলোক বুঝিলেন ছেলেরা হটিয়া যাইতেছে। আর ত সময় নাই! প্রাণপণ শক্তিতে মনের সমস্ত বল নিয়োজিত করিয়া তিনি আকাশের দিকে

লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। ভীষণ শব্দ হইল গুড়ুম্। গুণ্ডার দল থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার শব্দ হইল 'গুড়ুম্'। এবার পাশের বাড়ী থেকে। গুণ্ডারা হটিতে লাগিল। আবার 'গুড়ুম' এবার আর ফাঁকা আওআজ নয়, একটা গুণ্ডা ধরাশায়ী হইল। আর যায় কোথা? একমুহূর্তের মধ্যে সব পরিষ্কার।

পাশের বাড়ী থেকে বীরব্রত দ্রুতবেগে নামিয়া আসিল। দেখে ছেলেযা প্রায় সকলই আহত। বীরবলের আঘাত সাংঘাতিক। লাঠির ঘায়ে মাথার পিছনের দিকটা প্রায় আট ইঞ্চি চিড়িয়া গিয়াছে, বাম পাঁজরে ছুরিকার গভীর ক্ষত, অজস্রধারে রক্ত পড়িতেছে।

বীরব্রত বীরবলকে পাঁজা কোলে তুলিয়া ঘরে নিয়া গেল। তারপর অন্যান্য ছেলেদের ধরাধরি করিয়া ভিতরে রাখিয়া ডাক্তারের সন্ধানে ছুটিল।

প্রায় একঘণ্টা সে ডাক্তারের সন্ধানে ছুটাছুটি করিল, কিন্তু কোন ডাক্তারই এত রাত্রে ঘর থেকে বাহির হইতে সাহস করিলেন না। শেষে অনেক চেষ্টায় সে বরিশাল মেডিকেল মেসের কয়েকজন ছাত্রকে ধরিয়া আনিল। রাস্তা থেকে কিছু আইডিন ও কিছু বোরিক কটন কিনিয়া আহতদের ওখানে আসিয়া দেখে পাশের দু'তিন বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া আহত ছেলেদের শুশ্রূষায় লাগিয়া গিয়াছেন। জখমের সমস্ত রক্ত ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে, সকলকেই একটু একটু করিয়া গরম দুধ খাওয়ানো হইয়াছে। মহিলাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠ শোকবাষ্পাকুল।

বীরবলের রক্তপড়া কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। এক একবার ধুইয়া পরিষ্কার করা হইতেছে, আবার অল্পকালের মধ্যে ক্ষতস্থানের বস্ত্র রক্তে লাল হইয়া উঠিতেছে। যে মহিলাটি সর্বাপেক্ষা সাহসী ও

শুশ্রূষায় পারদর্শিনী, তিনি বীরবলের মাথার কাছে বসিয়াছিলেন। এত রক্ত দেখিয়া তাহার সমগ্র মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বহু কষ্টে রুদ্ধ ক্রন্দনবেগ সংবরণ করিতেছেন।

বীরব্রত সঙ্গীগণসহ ঘরে ঢুকিতেই তিনি ডুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"বাবারা, আগে একবার এদিকে এস। এর রক্ত যে কিছুতেই বন্ধ হয় না। উঃ, এত রক্ত পড়ছে, তাজা লাল টক্‌টকে রক্ত, আমার সর্বশরীর হিম হয়ে আসছে।"

তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে সরিয়া আসিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

অন্য সকলের ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করা দশ মিনিটের মধ্যেই হইয়া গেল। কাহারও কপাল ফাটিয়াছে, কাহারও মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে, কাহারও হাতের সব আঙ্গুল ছড়িয়া গিয়াছে। অল্পবিস্তর রক্তক্ষরণ সকলেরই হইয়াছে, কিন্তু কাহারও জখমই সাংঘাতিক না। কিন্তু বীরবলকে নিয়াই সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিল। ছেলেরা এত চেষ্টা করিল, কিন্তু রক্তপড়া কিছুতেই বন্ধ হইল না। অবশেষে হাসপাতালে নিয়া যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। ঘোড়ার গাড়ী নাই, ট্যাক্সি নাই, এত রাত্রে অ্যাম্বুলেন্স্ মিলিবে না, একটা খাটিয়ার উপর শোয়াইয়া সকলে নিয়া চলিল।

হাস্‌পাতালে পৌছিয়াই তারা অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জেনকে খবর দিল। তাঁর বাসা কাছেই ছিল, খবর পাইয়াই তিনি চলিয়া আসিলেন। নাড়ী দেখিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আরে সর্বনাশ, তোমরা এ করেছ কি? অতিরিক্ত রক্ত মোক্ষণে এ যে এখনই হার্টফেল করবে।"

সবেগে ক্ষতস্থানটা চাপিয়া ধরিয়া একটি ছেলেকে বলিলেন—"এই মুহূর্তে একজন নার্সকে ডেকে নিয়ে এসো, শীগ্‌গীর।"

ছেলেটি ছুটিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন নার্স আসিয়া হাজির।

ডাক্তার গম্ভীরস্বরে কি একটা ঔষধের নাম করিয়া বলিলেন—"এই ওষুধটা আর আমার ইন্‌জেক্‌সনের সিরিঞ্জ, এই মুহূর্তে।"

নার্স ছুটিয়া গেল। ডাক্তারের মুখের রেখা কুঞ্চিত ও কঠোর, চক্ষু একাগ্রভাবে রোগীর দিকে বিন্যস্ত। সমস্ত ছাত্রেরা ভীত, স্তম্ভিত—বীরব্রত নিশ্চল নিথর, পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া। হঠাৎ তার বীরবলের বাড়ীর কথা মনে হইল। সে ছুটিয়া গেল বীরবলের বাবার কাছে একখানা টেলীগ্রাম করিয়া দিতে।

নার্স সরঞ্জাম নিয়া আসিতেই ডাক্তার ক্ষিপ্রহস্তে ইন্‌জেক্‌সন দিলেন। এক মিনিট, দু' মিনিট, তিন মিনিট কারও মুখে কোন কথা নাই। শুধু দেওয়ালের ঘড়ীটা এতগুলি কম্পিত হৃৎপিণ্ডের তালে তালে বলিতেছিল টিক্, টিক্, টিক্।

রক্ত পড়াটা বুঝি বন্ধ হইল, চক্ষু বুঝি একটু উজ্জ্বল হইল। সকলের মনে একটু ক্ষীণ আশার রেখা, ডাক্তার একটা চেয়ার টানিয়া পাশে বসিয়া রহিলেন।

সমস্ত ঘরটা প্রেতপুরীর মত নীরব, নিঃশব্দ, থমথমে। শুধু বীরবলের শ্বাসের শব্দ বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে, সমস্ত শরীরটা মাঝে মাঝে এক একবার শিহরিয়া উঠিতেছে।

ডাক্তার দ্বিতীয়বার ইন্‌জেক্‌সনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ফোর্থ ইয়ারের একটি ছেলেকে বলিলেন—"এই ইন্‌জেক্‌সনটা দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। এতেই রক্তপড়া বন্ধ হবে। রাত্রি তিন টায় আর একটি

ইন্‌জেক্‌সন দিও। আর ভোরের দিকে আমাকে একবার খবর দিও।"

তারপর বীরব্রতের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"খুব সম্ভব এ ফাঁড়াটা কেটে গেল।"

সবে মাত্র তিনি ইন্‌জেক্‌সন দিতে উঠিয়াছেন, এমন সময় রোগী সবেগে নড়িয়া উঠিল। মনে হইল কি যেন এক অব্যক্ত গভীর যন্ত্রণায়, কি এক দুঃসহ নিদারুণ কষ্টে তার সমস্ত শরীর কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

ডাক্তার সবেগে তাকে চাপিয়া ধরিলেন। রোগী আবার নিশ্চল হইল, কিন্তু ক্ষতস্থান দিয়া দ্বিগুণ বেগে রক্ত ছুটিল। রক্ত বন্ধ করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ, নিষ্ফল হইল, সমস্ত বিছানা রক্তে লাল হইয়া গেল। ডাক্তার hopeless বলিয়া ঘর থেকে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

ছেলেরা অদূরাগত মৃত্যুর অভ্যগ্র পদধ্বনি যেন শুনিতে পাইতেছে। স্তব্ধ নীরবতায় নিশ্চিত। মৃত্যুর এই অবিচলিত আগমনে তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিঃসাড় চেতনাহীন মরণের কালোছায়া ধীরে ধীরে বীরবলের মুখের উপর একটা হিমশীতল যবনিকা টানিয়া দিতেছিল। রক্তক্ষরণের বেগ ও কমিয়া আসিয়াছে। এইবার হয়তঃ চিরতরেই বন্ধ হইবে।

বীরব্রত আর সেখানে থাকিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনবেগ দমন করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া গেল। বীরবলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই ইহার প্রতি সে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তারপর নানাঘাত [illegible] মধ্য দিয়া তাহারা কখনো বা খুব নিকটে আসিয়াছে, কখনো বা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাকে সে মন থেকে একেবারে বহুদূরে ঠেলিতে পারে নাই। সুবীথি ও বীরবলের পরস্পরের আকর্ষণে, সুবীথিকে তার কাছ থেকে দূরে নিয়া যাওয়ায়, ইহার উপর সে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রারম্ভ থেকে এই বীর যুবকের কার্যকলাপ, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া গুণ্ডাদের হাত হইতে অত্যাচারিতের ধন, প্রাণ ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ইহার বীরত্ব ও মহত্ত্ব তাহাকে আবার ইহার দিকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তারপর আজিকার এই অপূর্ব আত্মত্যাগের মহিমা! সে যদি পনর মিনিট পূর্ব্বে ও খবর পাইত? তার সমগ্র দলের উপর সে হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। আর সুবীথি! এই আঘাতের আকস্মিকতায় সে কতখানি অভিভূত হইবে! অকস্মাৎ বীরব্রতের চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাহিরে একটি বেঞ্চির উপর বসিয়া সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

একটি ছেলের ধাক্কায় চমকিত হইয়া চাহিতেই সে বলিল—"সব শেষ হয়ে গেছে।"

[পঁয়ত্রিশ]

টেলীগ্রাম পাইয়া বীরবলের পিতা শিবেশ্বর বাবু যখন বড়ছেলে ছেলেরা সব ম্লানমুখে সুবলকে নিয়া পৌছিলেন তখন বীরবলের প্রাণহীন দেহের চারিপাশে বসিয়া বুঝি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুখের সমস্ত রক্ত ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে, সমগ্র মুখখানিতে তখনও একটা নিবিড় প্রশান্তি।

শিবেশ্বর বাবু আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিলেন না। সন্তপ্ত বিয়োগ বিধুরা জননীর মত বিপুল ক্রন্দনে তিনি ছেলের উপর

ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পুত্রহীন বৃদ্ধের সে কি আকুল বিলাপ, সে কি হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ, সে কি মর্মান্তিক হাহাকার! ছেলেরা এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারল না। শোকের এরূপ করুণ প্রতিচ্ছবি, বিলাপের এরূপ মর্মন্তুদ তীব্র উচ্ছ্বাস তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রামকে ক্ষণকালের জন্য নিশ্চেতন করিয়া দিল। তারা কি করিবে, কি বলিয়া এই শোকান্মত্ত বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। পিতার এই বিপুল ক্রন্দনবেগ সুবলকে ও স্তম্ভিত করিয়া দিল। অত্যন্ত প্রিয় এবং উপযুক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরবলের এই শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুতে তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতেছিল, মনে হইতেছিল সমস্ত বুকখানা বুঝি এই আকস্মিক সুতীব্র আঘাতে চুরমার হইয়া যাইবে, কিন্তু পিতার এই আকুল উন্মত্ত শোকাবেগ তার নিজের শোক ভুলাইয়া দিল। বৃদ্ধ পিতার পাশে স্থাণুর মত বসিয়া পড়িল, শুধু তার দু'চোখ গড়াইয়া অশ্রুর বাণ ডাকিয়া আনিল।

জীবনের এই মর্মান্তিক বিয়োগের দিকটা বীরব্রত দেখে নাই। মানুষের জীবন যে মানুষের নিকট এত প্রিয় হয়, সন্তানের বিয়োগ ব্যথা যে পিতার বুকে এরূপ নির্মম আঘাত করে, ইহা তাহার জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতা। এই নবলব্ধ গভীর অথচ নিবিড় অনুভূতি নিয়া সে পরমশ্রদ্ধাভরে পিতার এই অপূর্ব অপত্যস্নেহের প্রকাশকে অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে দেখিতেছিল।

হঠাৎ সুবীথির কণ্ঠস্বরে সে অতিমাত্রায় চমকাইয়া উঠিল। সুবীথি এখানে কেন আসিল? সে কি বীরবলের মৃত্যুর খবর পাইয়াছে? কে তাহাকে খবর দিল? বীরব্রত দিশাহারা হইয়া উঠিল। তাকে এখানে কখনই আসিতে দেওয়া হইবে না। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

বীরব্রতকে দেখিয়াই সুবীথি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দাদা! বীরবলবাবু কোথায়? আমি তাকে দেখব।"

বীরব্রত সুবীথির দিকে করুণভাবে তাকাইয়া বলিল—"বীথি আর কাকে দেখবে? বীরবলবাবু নেই। চল, তোমায় বাসা রেখে আনি।"

"অ্যাঁ, সত্যি বীরবলবাবু নেই! দাদা, দাদা—" সুবীথি মূর্চ্ছিত হইয়া বীরব্রতের কোলে ঢলিয়া পড়িল।

বীরব্রত তাড়াতাড়ি একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া সুবীথিকে নিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সেখানে মূর্ছিত সুবীথিকে মার কাছে রাখিয়া সে আবার হাসপাতালে ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার পথে সমস্ত রাস্তাই সে এই ভাবিতে লাগিল যে সুবীথি বীরবলকে সত্যই কতখানি ভালবাসে, তাহার মৃত্যুতে সে কতখানি অভিভূত হইবে।

শোকোন্মত্ত বৃদ্ধের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সুবল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বাবা, এবার যে বীরবলের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। ছেলেরা অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে।"

শিবেশ্বর বাবু ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"অ্যাঁ, বীরবলকে আমার শ্মশানে নিয়ে যাবে? তবে সত্যিই বীরবল নেই! ওরে আমি যে কিছুতেই একথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমি যে কত আশা করে ছিলাম, ছেলে আমি যে কত আশা করে ছিলাম, ছেলে আমার বড় বিদ্বান হবে, ভাল চাকুরী করবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমার সব আশা, সব ভরসা যে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।"

বৃদ্ধ আবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বীরব্রত এতক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলাইয়াছে। সে ধীরে ধীরে বৃদ্ধের কাছে আসিয়া

বলিল, ধীরে ধীরে বলিল—"বীরবলবাবু মৃত্যুদ্বারা বংশের মুখ গৌরবজ্জ্বল করে গেছেন। দুর্বৃত্ত গুণ্ডাদের হাত থেকে বিপন্না নারীদের মর্যাদা রক্ষা করতে তার এই আত্ম বলিদান।"

বৃদ্ধ অশ্রুপূর্ণ চোখে বীরব্রতের দিকে তাকাইলেন। অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"ছেলে আমার মহৎ কাজে প্রাণ বিসর্জন করেছে, মৃত্যু তাকে অমর করেছে, এ সমস্তই বুঝি, কিন্তু মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানে না! সমস্ত অন্তর তার অভাবে যে শূন্য হয়ে গেছে, তা পূরণ করব কি দিয়ে?" আবার তার অশ্রুবেগ দ্বিগুণ হইল।

বীরব্রত বলিল—"আপনি প্রধান, সংসারের বহু অভিজ্ঞতাই লাভ করেছেন, আপনাকে আমরা কি বলে সান্ত্বনা দেব? আর সান্ত্বনা দেবার মত ভাষাও খুঁজে পাচ্ছি না। নিয়তির অমোঘ বজ্র এরূপ অতর্কিতেই তার সমস্ত নিষ্ঠুরতা নিয়ে মানুষকে নির্মম আঘাত করে।"

শিবেশ্বর বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা, নিয়তির নির্মম আঘাতই বটে। তা না হলে ছেলেকেই বা কলেজে পড়াবার সাধ হবে কেন? ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার রঙীন স্বপ্নে যখন মশগুল ছিলাম, তখন ভাগ্য নিশ্চয়ই পেছন থেকে কঠোর হাসি হেসেছিল। ছেলেকে কলেজে পড়াতে না পাঠালে ত আর আমার এই সর্বনাশ হোত না।"

বৃদ্ধের দু'চোখ প্লাবিয়া অঝোরে অশ্রুর ধারা ঝরিতে লাগিল।

বীরব্রত বলিল—"আপনি আমাদের বাসায় চলে যান। আমি একজন লোক দিচ্ছি। সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন, বীরবলবাবু আমাদেরও কতখানি আপনার ছিলেন। আমার ছোট বোন ত শুনেই মূর্ছা গেছে, মার অবস্থা জানি না। আমরা সুবলবাবুকে নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ অর্থশূন্য দৃষ্টিতে ফ্যান ফ্যান করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বীরব্রত জোর করিয়া তাকে একখানা ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিল। একটি ছেলেকে সঙ্গে দিল, তাদের বাসায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য।

ট্যাক্সিতে উঠিয়াই বৃদ্ধ আবার কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন। তার বীরবলকে যে শ্মশানে নিয়া যাইবে তার দেহ ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে, আর তার হাসি মুখ সে দেখিতে পাইবে না। সে লাফাইয়া ট্যাক্সি থেকে নামিতে গেল। ছেলেটি তাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল, ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

দূর হইতে ছেলেদের কাণে ভাসিয়া আসিতে লাগিল পুত্রহারা বৃদ্ধের করুণ বিলাপধ্বনি, শোকের প্রাণস্পর্শী উচ্ছ্বাস।

ছেলেরা বীরবলের মৃতদেহ কাঁধে নিয়া বলিল—"বল হরি, হরি বোল।"

(সমাপ্ত)